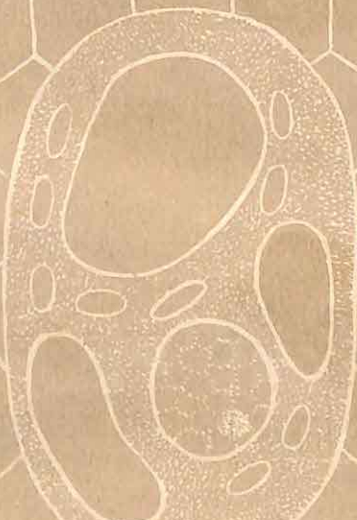
জীবন-বিজ্ঞান



কুণ্ডু • দাশ • কুণ্ডু

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জীবন-বিজ্ঞান-এর নূতন পাঠ্যনির্ঘণ্ট অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত [টি, বি. নং 76|7|এল.এস.|95 তাং 11|1|77 দ্রষ্টব্য।]

জীবন-বিজ্ঞান

[দ্বিতীয় ভাগ]

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু, এম. এস-সি (কলিকাতা), এম. এস-সি (ব্রুনেল), পি-এইচ. ডি. (কলিকাতা)
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুল এবং মুরলীধর গার্লস হাই স্কুল।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ, এম. এস-সি.
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক, অক্ষয় শিক্ষায়তন (হাওড়া)।

শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু, এম. এস-সি., ডি. ফিল. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)
গবেষক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়;
প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
6, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-9

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, 1974
পঞ্চম সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারি, 1977

মূল্য 3 টাকা মাত্র।

[ভারত সরকার কর্তৃক স্বল্পমূল্যে প্রদত্ত কাগজে এই পুস্তক মুদ্রিত।]

6, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-9, হইতে শ্রীপ্রদীপকুমার বারিক, কর্তৃক প্রকাশিত এবং 60, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-9, নিউ রূপলেখা প্রেস হইতে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই বইয়ে পাঠ্যনির্ঘণ্টের আক্ষরিক রূপায়ণের চেয়ে, তার মূল বক্তব্যের যথাযথ রূপদানের আন্তরিক চেষ্টা করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের বয়ঃসীমা এবং গ্রহণ-ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে, বিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলি যথাসাধ্য সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিচিতি-প্রসঙ্গে বিধিবদ্ধ শ্রেণী-বিভাগ না দিয়ে কেবল বাহ্য গঠনের ভিত্তিতে কি করে উদ্ভিদ ও প্রাণী চেনা যায়, তার উপরেই বেশি জোর দেওয়া সমীচীন মনে করেছি। মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্যের তালিকা দেওয়া বহু-প্রচলিত হলেও, এই স্পৃহা দমন করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, জীবনের বহুমুখী প্রকাশের মাঝে ঐক্যের সন্ধান করা জীবন-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

বানানের জন্য 'চলন্তিকা' এবং পরিভাষার জন্য প্রধানতঃ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' অনুসরণ করেছি।

লেখা এবং ছাপার কাজ খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে হয়েছে। কাজেই, ত্রুটি থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকা, সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে বইটির ত্রুটি-নির্দেশ এবং উন্নতিমূলক পরামর্শের সাদর আহ্বান জানাই।

কলিকাতা,
8 ফেব্রুয়ারি, 1975

শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু,
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ,
শ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ডু।

সূচিপত্র

পরিভাষা

অগ্রপদ—Fore limb
অগ্রমুকুল—Apical bud
অংকতল—Ventral surface
অংকুরোদ্গম—Germination
অংকুরোদ্গম-ক্ষমতা—Viability
অংগজ বিস্তার—Vegetative propagation
অংগুরীমাল—Annelida
অণুফলক—Leaflet
অণুসূত্র—Hyphae
অণ্ডকোষ—Scrotum
অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র—Accessory respiratory organ
অনিষিক্ত ডিম—Unfertilised egg
অন্তর্বাহী রক্তবাহ—Afferent blood vessel
অন্তর্বীজ—Kernel
অপুষ্পক—Non-flowering
অপ্রকৃত ফল—False fruit
অপ্রতিসম—Asymmetrical
অবসারণী-ছিদ্র—Cloacal aperture
অবিদারী ফল—Indehiscent fruit
অবৃন্তক—Sessile
অমেরুদণ্ডী—Invertebrate
অযুগ্ম—Unpaired
অযৌন রেণু—Spore
অরীয়ভাবে—Radially
অর্ধ-বায়ব কাণ্ড—Sub-aerial stem
অর্বুদযুক্ত মূল—Nodulose root
অসম্পূর্ণ পুষ্প—Incomplete flower
অসস্যল—Non-endospermic
অস্থানিক মূল—Adventitious root
আকর্ষ—Tendril
আদ্যপ্রাণী—Protozoa
আন্তরযন্ত্রীয় পিণ্ড—Visceral mass
উদ্ভিদ-রাজ্য—Plant kingdom
উপক্ষার—Alkaloid
উপদ্রব—Pest
উপপত্র—Stipule
উপপদ—Proleg
উপপল্লব—Nictitating membrane
উপমক্ষিকা—Flea
উপাংগ—Appendage
উভচর—Amphibia
উভলিংগ—Bisexual
ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব—Uupper eye-lid
ঊর্ধ্বোষ্ঠ—Upper lip
একক পত্র—Simple leaf
একক পুষ্প—Solitary flower
একনালীদেহী—Coelenterata
একবীজপত্রী—Monocotyledonous
একলিংগ—Unisexual
এ'টেল পোকা—Tick
কক্ষ—Axil
কন্দ—Bulb
কন্দাল মূল—Tuberous root
কর্ণকুহর—Auditory meatus
কর্ণছত্র—Pinna
কর্ণছিদ্র—Auditory aperture
কর্ণপটহ—Tympanum
কর্ষিকা—Tentacle
কাক্ষিক মুকুল—Axillary bud
কাণ্ড—Stem
কানকো—Operculum
কাষ্ঠ-উৎপাদী—Timber-yielding
কূর্চ—Bristle
কৃমি-জাতীয় প্রাণী—Helminths
ক্লীব—Neuter
খাদ্যশস্য—Cereals
খুর—Hoof
গর্ভদণ্ড—Style
গর্ভপত্র—Carpel
গর্ভমুণ্ড—Stigma
গুঁড়িকন্দ—Corm
গুচ্ছমূল—Fibrous root
গুচ্ছিত মূল—Fasciculated root
গুটি—Cocoon
গুম্ফ—Barbel, Vibrissa
গুল্ম—Shrub
গোল কৃমি—Round worm
গ্রন্থি—Gland
গ্রন্থিকাণ্ড—Rhizome
চঞ্চু—Beak
চোয়াল—Jaw, Mandible
চ্যাপ্টা কৃমি—Flat worm
ছত্রাক—Fungi

ছিদ্রাল প্রাণী—Porifera
জঙ্ঘা—Shank
জনন-ছিদ্র—Genital pore, Gonopore, Genital aperture
জালিকা শিরাবিন্যাস—Reticulate venation
জিওল মাছ—Air-breathing fish
ঝুরিমূল—Prop root
ঠেশমূল—Stilt root
ডিম্বকনাভি—Hilum
ডিম্বকরন্ধ্র—Micropyle
ডিম্বাশয়—Ovary
ঢাকনি—Operculum
তন্তু-উৎপাদী—Fibre-yielding
তন্তুময় ড্রুপ—Fibrous drupe
তরীদল—Keel
তারা-মাছ—Star-fish
তুঁত রেশম মথ—Mulberry Silk Moth
তুণ্ড—Snout
তৈল-উৎপাদী—Oil-yielding
দলমণ্ডল—Corolla
দলাংশ—Petal
দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে—Bilaterally
দ্বিবীজপত্রী—Dicotyledonous
দেহকাণ্ড—Trunk
দেহ-খণ্ডক—Body segment
দেহ-গঠনকারী খাদ্য—Body building food
ধ্বজা—Standard
নখর—Claw
নাসারন্ধ্র—Nostril
নিম্নোষ্ঠ—Lower lip
নিম্ন-নেত্রপল্লব—Lower eye-lid
নিষিক্ত ডিম—Fertilised egg
নীরস ফল—Dry fruit
পক্ষ—Wing
পক্ষী—Aves
পতঙ্গ—Insect
পতঙ্গভুক্—Insectivorous
পত্রকণ্টক—Spine
পত্রক্ষত—Leaf scar
পত্রমূল—Leaf base
পত্রাশয়ী মূল—Foliar root
পরিবর্তন—Modification
পর্ণকাণ্ড—Phylloclade
পর্ব—Node
পর্বমধ্য—Internode
পল্লবপত্র—Foliage leaf
পশ্চাৎ-পদ—Hind limb
পাখনা—Fin
পায়ু—Anus
পায়ু-কূর্চ—Anal cerci
পায়ু-পাখনা—Anal fin
পার্শ্বরেখা—Lateral lines
পুংকেশর—Stamen
পুং-জননেন্দ্রিয়—Penis
পুং-পুষ্প—Male flower
পুংস্তবক—Androecium
পুচ্ছ-পাখনা—Caudal fin
পুঞ্জাক্ষি—Compound eye
পুষ্প—Flower
পুষ্পপুট—Perianth
পুষ্পবিন্যাস—Inflorescence
পুষ্পাক্ষ—Thalamus
পৃষ্ঠতল—Dorsal surface
পৃষ্ঠ-পাখনা—Dorsal fin
পেট, উদর—Abdomen
প্রকৃত ফল—True fruit
প্রকোষ্ঠ—Fore arm
প্রগণ্ড—Upper arm
প্রতিসম—Symmetrical
প্রধান মূল—Tap root
প্রধান মূলতন্ত্র—Tap root system
প্রধান শিরা—Main vein
প্রশাখা—Sub-branch
প্রশাখা-মূল—Tertiary root
প্রাণিরাজ্য—Animal kingdom
প্রাণী-শ্বেতসার—Animal starch
ফলক—Leaf-blade
ফলত্বক্—Pericarp
ফুলকা—Gill
ফুলকার খিলান—Gill arch
ফুলকার ঝালর—Gill raker
ফুলকার পাত—Gill lamellae
ফুলকা-সূত্র—Gill filament
বক্ষ—Thorax
বক্ষ-পাখনা—Pectoral fin
বর্ম—Scutes
বর্ষজীবী—Annuals

বহির্বাহী রক্তবাহ—Efferent blood vessel
বিটপ—Shoot
বিদারী ফল—Dehiscent fruit
বীজ-অন্তস্ত্বক্—Tegmen
বীজপত্র—Cotyledon
বীজ-বহিস্ত্বক্—Testa
বীজত্বক্—Seed-coat
বীরুৎ—Herb
বুক—Thorax
বৃতি—Calyx
বৃত্যংশ—Sepal
বৃন্ত—Petiole
বেলনাকার—Cylindrical
ব্যক্তবীজী—Gymnosperms
ভাণ্ডার মূল—Storage root
ভেষজ—Medicinal
ভ্রূণ—Embryo
ভ্রূণমুকুল—Plumule
ভ্রূণমূল—Radicle
ভ্রূণাক্ষ—Tigellum
মকরন্দ—Nectar
মঞ্জরীদণ্ড—Rachis
মৎস্য—Pisces
মধ্যশিরা—Mid-rib
মুকুল—Bud
মুখোপাঙ্গ—Mouth parts
মূত্রছিদ্র—Urinary aperture
মূল—Root
মূলকাকার—Fusiform
মূলজেব—Root-pocket
মূলত্র—Root cap
মূলরোম—Root-hair
মৃদ্‌গত—Underground
মৃদ্‌বতী—Hypogeal
মৃদভেদী—Epigeal
মেরুদণ্ড—Vertebral column
মেরুদণ্ডী—Vertebrate
যৌগপত্র—Compound leaf
রক্ত-চাপ—Blood-pressure
রক্ষী খাদ্য—Protective food
রেশম-কীট—Silk worm
রেশম-গ্রন্থি—Silk gland
রেশম মথ—Silk moth
রেণুস্থলী—Sporangium
লিপ্তপাদ—Webbed feet
শল্কপত্র—Scale leaf
শাখা-আকর্ষ—Steam-tendril
শাখা-কণ্টক—Thorn
শাখামূল—Secondary root
শাঙ্কব—Conical
শালগমাকার—Napiform
শিম্ব—Legume, Pod
শির-উপাঙ্গ—Cephalic appendages
শিরোবক্ষ—Cephalothorax
শীর্ষমুকুল—Apical bud
শুঁড়, শুণ্ড—Proboscis
শুঙ্গ—Antenna
শূক—Larva
শেওলা—Algae
শ্রোণী-পাখনা—Pelvic fin
সন্ধিপদ—Arthropod
সন্ধিল—Jointed
সপুষ্পক—Flowering
সবৃন্তক—Petiolate
সমঙ্গ—Imago
সমাঙ্গদেহ—Thallus
সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ—Thallophytes
সমান্তরাল শিরাবিন্যাস—Parallel venation
সমুদ্র-শসা—Sea-cucumber
সরস ফল—Fleshy fruit
সরীসৃপ—Reptile
সস্য—Endosperm
সস্যল—Endospermic
সাগর-কুসুম—Sea anemone
সুপ্ত অবস্থা—Dormant condition
সুষম খাদ্য—Balanced diet
স্তনবৃন্ত—Teat
স্তন্যগ্রন্থি—Mammary gland
স্তন্যপায়ী—Mammal
স্তম্ভমূল—Prop root
স্ত্রী-পুষ্প Female flower
স্ত্রীস্তবক—Gynaecium
স্থানিক মূল—True root
স্ফীতকন্দ—Tuber

উদ্ভিদ-রাজ্য ও প্রাণিরাজ্য | 1

পরিবেশের নানা ধরনের গাছ-পালা, পোকা-মাকড় ও পশু-পাখি সম্বন্ধে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে নানা রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

বিভিন্ন ধরনের জীবের বাইরের চেহারায় কেবল অমিল-ই নেই, মিল-ও আছে অনেক। মিল আছে এইরকম কিছু উদ্ভিদ অথবা প্রাণী নিয়ে কতকগুলি গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। ফলে, কোনও গোষ্ঠীর দুয়েকটি জীব সম্বন্ধে বিশদভাবে জানলে, সেই ধরনের অন্য জীব সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। এইভাবে, অপরিচিত কোনও উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী দেখলে, সেটা কোন্ গোষ্ঠীর উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী, তা শনাক্ত করা যায় এবং তার বিশেষত্বগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়।

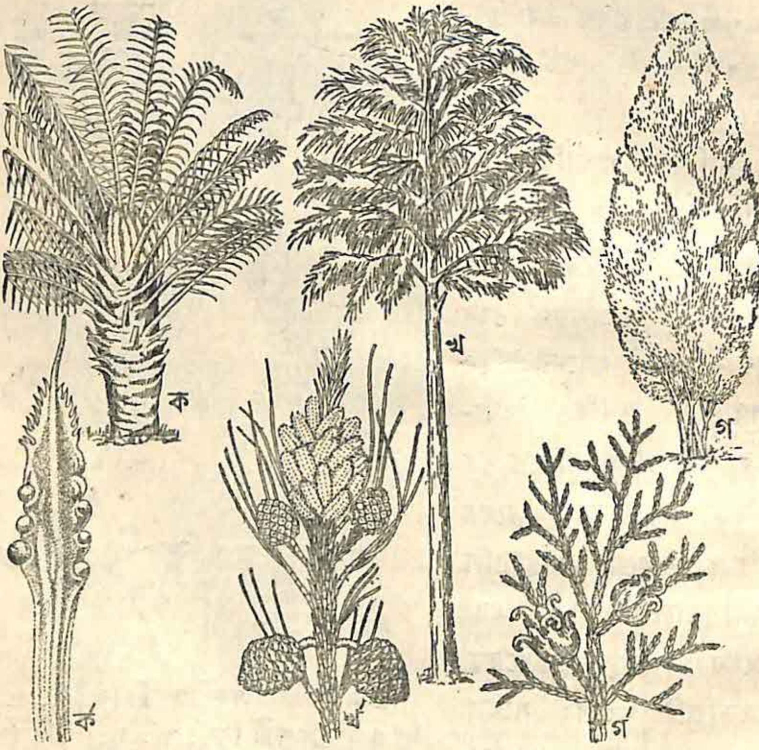
উদ্ভিদ-রাজ্য : বাহ্য গঠনের উপর ভিত্তি করে, কিভাবে উদ্ভিদদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়, এবং বাইরে থেকে কিভাবে উদ্ভিদদের চেনা যায়, সে বিষয়ে নিচে বলা হল।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পদ্ম, আম এবং মটর গাছ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এরা কেউ জলে, আবার কেউ বা মাটিতে জন্মায়। বাইরে থেকে এদের তেমন কিছু মিল নজরে পড়ে না। কিন্তু, এদের সকলের **ফুল** বা **পুষ্প** হয়। সেইজন্য, এদের **সপুষ্প**ক উদ্ভিদ বলা হয়। পুষ্প থেকে **বীজ** হয়। বীজের সাহায্যে এরা বংশবিস্তার করে। সুতরাং, পুষ্প এবং বীজ দেখে সপুষ্পক উদ্ভিদ চেনা যায়। এছাড়া, সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা বা পত্র থাকে।

বেশির ভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদের পুষ্প থেকে ফল হয়। ফলের মধ্যে বীজ থাকে। বীজ সাধারণতঃ বাইরে থেকে দেখা যায় না। ফল

ধরনের মূলকে গুচ্ছমূল বলে। সব একবীজপত্রী উদ্ভিদের গুচ্ছমূল থাকে।

মটর, অপরাজিতা, সরিষা, মুলা, জবা, লেবু, চাঁপা, গোলাপ, আম, জাম, বট, শাল, সেগুন প্রভৃতি গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ বলে। এদের কাণ্ডে সাধারণতঃ শাখা-প্রশাখা থাকে। এদের প্রধান মূল আছে। প্রধান মূল থেকে শাখা-মূল বের হয়।



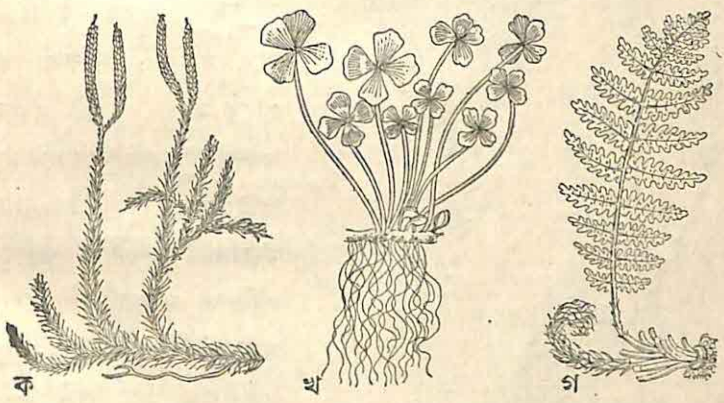
3 নং চিত্র— কয়েকটি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ : ক. সাইকাস ; খ পাইন ; গ বিলাতী ঝাউ ; ক´ সাইকাসের বীজ-সহ গর্ভকেশর ; খ´ ও গ´ যথাক্রমে পাইন ও বিলাতী ঝাউয়ের বীজ-সহ পল্লব।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রের ফলকে শিরা-উপশিরাগুলি জালকের মতো ছড়িয়ে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এইরকম উদ্ভিদ পরিধিতেও বাড়ে। এদের পুষ্পের স্তবকের অংশগুলির সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচ কিংবা পাঁচের গুণিতক (2 নং চিত্র-ক´, খ´. ও গ´.)।

যে সব সপুষ্পক উদ্ভিদের বিষয়ে বলা হল, তাদের সকলের পুষ্প, ফল এবং বীজ হয় ; অর্থাৎ, এরা সকলেই গুপ্তবীজী। আর এক ধরনের সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে, যাদের পুষ্প থেকে সরাসরি বীজ হয়, ফল হয় না ; কাজেই, এদের বীজগুলি বাইরে থেকে দেখা যায়। এদের **ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ** বলা হয়। সমস্ত ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের পুষ্পে মাত্র একটি স্তবক থাকে— পুংকেশর অথবা গর্ভকেশর। বেশির ভাগ ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ বৃক্ষ-জাতীয়। সাইকাস (*Cycas*), পাইন (Pine) দেওদার ও বিলাতী ঝাউ এই গোষ্ঠীর উদ্ভিদ (3 নং চিত্র)।

যে সব উদ্ভিদে পুষ্প, ফল এবং বীজ হয় না, তাদের **অপুষ্পক উদ্ভিদ** বলে।

পুকুরপাড়ের সেঁতসেঁতে মাটিতে যে সুষনি শাক, কিংবা বড় বড় বৃক্ষের শাখায় যে ফার্ণ (Ferns) জন্মায়, তারা অপুষ্পক উদ্ভিদ।

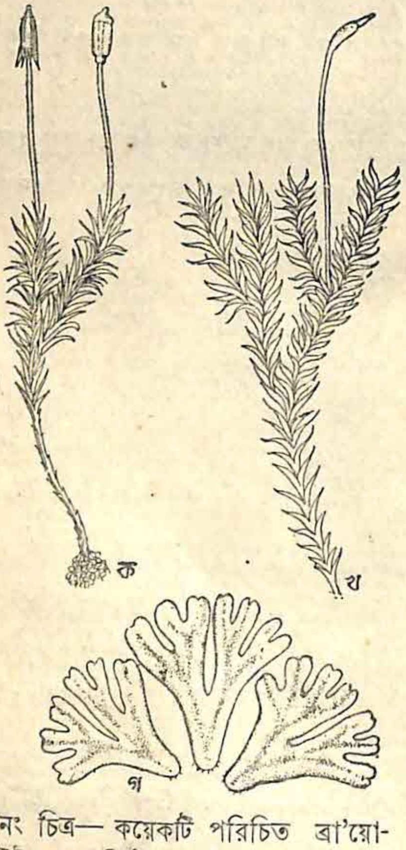


4 নং চিত্র— কয়েকটি পরিচিত টেরিডোফাইট : ক. লাইকোপোডিয়াম ; খ. সুষনি শাক ; গ. ফার্ণ।

এদের টেরিডোফাইট (Pteridophytes) বা **ফার্ণ-জাতীয় উদ্ভিদ** বলে। এদের, মূল, কাণ্ড ও পত্র থাকে। পরিণত উদ্ভিদের পত্রের নিচের তলে কিংবা কক্ষে থলির মতো অঙ্গ দেখা যায়। এদের বলে **রেণুস্থলী**। রেণুস্থলীর মধ্যে গুঁড়া গুঁড়া **অযৌন রেণু** উৎপন্ন হয়। রেণুর সাহায্যে এরা বংশবিস্তার করে। রেণুস্থলী দেখে এদের

সহজে চেনা যায়। আবার, ফার্ণের পত্র পালকের মতো। এদের কচি পত্র কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। লাইকোপোডিয়াম (*Lycopodium*), সেলাজিনেলা (*Selaginella*) ইত্যাদি আরও কয়েক রকম ফার্ণ-জাতীয় উদ্ভিদ সচরাচর দেখা যায়। এদের পত্র খুব ছোট এবং দেখতে কতকটা আঁশের মতো।

বর্ষাকালে সেঁতসেঁতে দেওয়ালের গায়ে, বড় বড় গাছের গুঁড়িতে গাল্‌চের মতো ঘন হয়ে মস (Moss) বেড়ে ওঠে। মস আর এক ধরনের অপুষ্পক উদ্ভিদ; তবে, টেরিডোফাইট থেকে আলাদা। এদের বলে **ব্রা' য়ো ফা ই ট** (**Bryophytes**) বা **মস-জাতীয় উদ্ভিদ**। এদের কাণ্ড ও পত্র থাকে; কিন্তু, মূল থাকে না। মূলের বদলে, কতকটা মূলের মতো দেখতে **রাইজয়েড** (**Rhizoids**) নামের অঙ্গ থাকে। পরিণত মসের ডগা থেকে সরু ডাঁটির মতো দেখতে একরকম অঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই ডাঁটির মাথায় একটি ফোলা অংশ থাকে। ফোলা অংশটিকে মসের **ক্যাপ্‌ সুল** (**Capsule**) বলে। ক্যাপ্‌সুলের মধ্যে রেণুস্থলী থাকে। ক্যাপ্‌সুল দেখেও মস চেনা যায়। মস ছাড়া, আরও কয়েক রকম



5 নং চিত্র— কয়েকটি পরিচিত ব্রা'য়োফাইট: ক. পলিট্রিকাম (*Polytrichum*); খ বারবিউলা (*Barbula*); গ. রিক্‌শিয়া।

ব্রা'য়োফাইট দেখা যায়। এদের পত্র কিংবা কাণ্ড থাকে না। এরা মাটির উপর বিছিয়ে থাকে। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে, এদের দেহের নিচের তলে প্রচুর রাইজয়েড দেখা যায়। রিক্শিয়া (*Riccia*) এই ধরনের ব্রা'য়োফাইট।

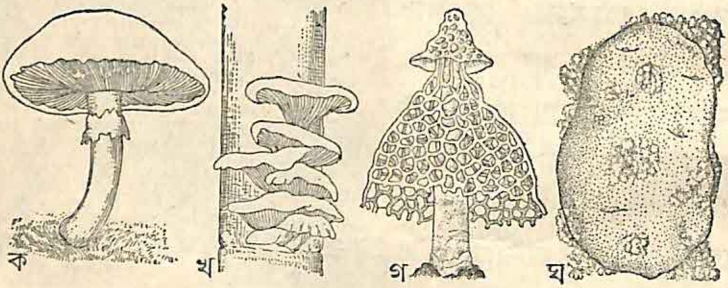
পুকুরের পাড়ে কিংবা বদ্ধ জলাশয়ের উপর সবুজ সরের মতো, অথবা কুয়ার পাড়ে কিংবা কলতলায় পিছল সবুজ রঙের আস্তরণ থাকে। এগুলি **শেওলা**। এছাড়া, ভিজা মাটিতে, গাছের গুঁড়িতে এবং সমুদ্রের লোনা জলেও শেওলা দেখা যায়। শেওলার দেহে কাণ্ড, মূল ও পত্র আলাদা করা যায় না। এই ধরনের দেহ-গঠনকে **সমাঙ্গ-দেহ** বলে। অধিকাংশ শেওলার দেহ একটিমাত্র কোষ দিয়ে গঠিত ; কাজেই, এদের খালি চোখে দেখা যায় না। তবে অগণিত কোষ একসঙ্গে থাকলে, তাদের এবং বহুকোষী শেওলাদের খালি চোখে দেখা যায়। ক্লোরোফিল (Chlorophyll) থাকায়, শেওলার রঙ সবুজ। কাজেই, সবুজ রঙ এবং সমাঙ্গদেহ দেখে শেওলা চেনা যায়। কারা (*Chara*) নামের এক ধরনের শেওলা মিঠাজলে দেখা যায়। উল্ভা (*Ulva*), ফিউকাস (*Fucus*) প্রভৃতি শেওলা সামুদ্রিক এবং আকারে বেশ বড়।



6নং চিত্র— বহুকোষী শেওলা : ক. কারা ; খ. ফিউকাস ; গ. উল্ভা।

ব্যাঙের ছাতা-ও একরকমের উদ্ভিদ। এদেরও দেহ কাণ্ড, মূল ও পত্রে আলাদা করা যায় না, অর্থাৎ সমাঙ্গদেহ। চলতি কথায় এদের ছাতা বলে ; বিজ্ঞানের ভাষায় এরা ছত্রাক। ক্লোরোফিল না থাকায়, সমস্ত ছত্রাক দেখতে সাদা কিংবা ঘোলাটে। শেওলা ও ছত্রাকের এটাই প্রধান পার্থক্য। কাজেই সমাঙ্গদেহ ও সাদা অথবা

ঘোলাটে রঙ হলেই স্বচ্ছন্দে ছত্রাক চেনা যেতে পারে। কতকগুলি ছত্রাক, অবশ্য এককোষী। বেশির ভাগ ছত্রাক জৈব পদার্থ-যুক্ত মাটিতে জন্মায়। কতকগুলি আবার অন্য গাছ-পালা অথবা প্রাণিদেহে বসবাস করে, রোগ সৃষ্টি করে। গোল-আলুর গায়ে এক ধরনের ছত্রাক এইভাবে রোগ সৃষ্টি করে। এর ফলে গোল-আলুর পচন ধরে। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ভিজা কাঠের উপরে এবং সেঁতসেঁতে মাটিতে নানা রকমের ছত্রাক দেখা যায়। বেশ কয়েক দিন ধরে ফেলে-রাখা জেলি (Jelly), জ্যাম (Jam), পাঁউরুটি কিংবা



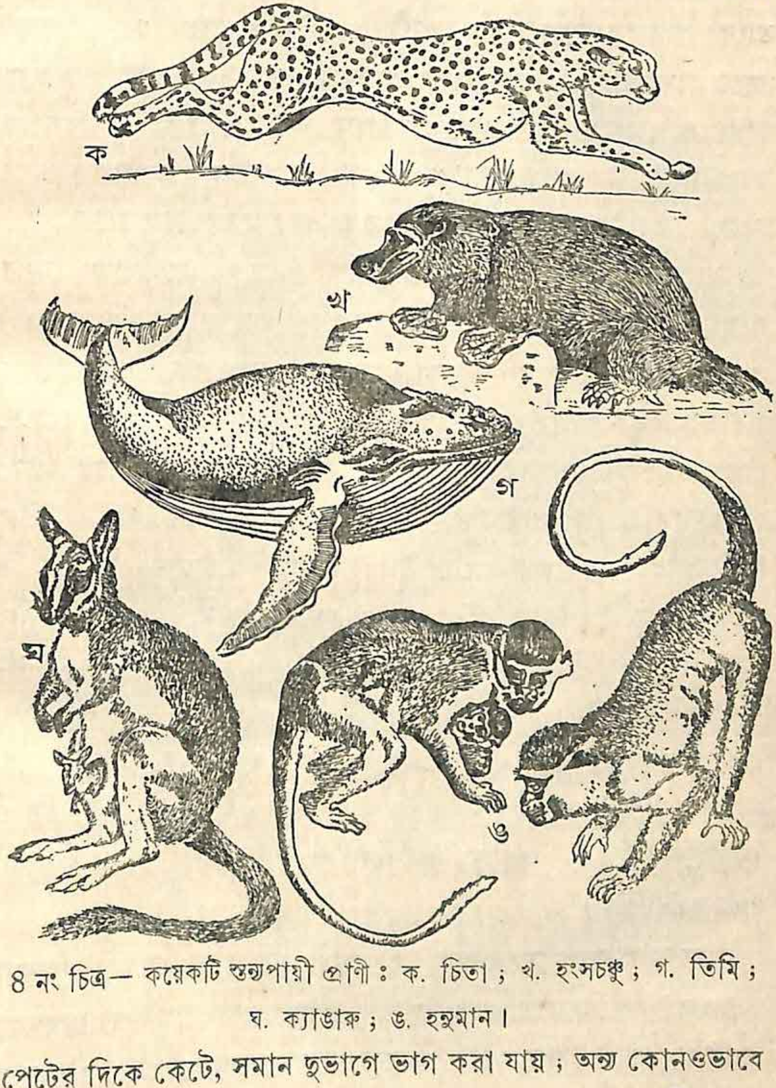
7 নং চিত্র— কয়েকটি পরিচিত ছত্রাক : ক. ব্যাঙের ছাতা ; খ. প্লুরোটাস (*Pleurotus*) ; গ. ডিক্টিওফোরা (*Dictyophora*) ; ঘ. গোল-আলুর পচন সৃষ্টিকারী রোগজনক ছত্রাক।

ফলের খোসার উপর পেঁজা তুলার মতো অথবা ধূসর গুঁড়ার মতো ছাতা পড়তে দেখা যায়। এগুলি বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক।

সমাঙ্গদেহ থাকায়, শেওলা ও ছত্রাককে একসঙ্গে **সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ** বলে।

প্রাণিরাজ্য : মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পায়রা, কাঠবিড়াল— এরা পরিচিত প্রাণী। এরা কেউ জলে থাকে, কেউ বায়ুতে ওড়ে, কেউ মাটির উপর বুকে ভর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে। এদের চেহারায় যেমন খুব মিল নেই; তেমনি এদের বসতিও আলাদা। বাইরে থেকে এদের তফাৎটাই বেশি নজরে পড়ে। তবু এদের সকলেরই পিঠের দিকে **মেরুদণ্ড** থাকায়, এরা সকলে **মেরুদণ্ডী** প্রাণী নামে পরিচিত। মেরুদণ্ড ছোট ছোট দণ্ডের মতো হাড় দিয়ে তৈরী। মেরুদণ্ড বাইরে

থেকে দেখা যায় না, কিন্তু এর অস্তিত্ব বোঝা যায়। দেহের যে দিকে মেরুদণ্ড থাকে, সেটা পিঠের দিক বা **পৃষ্ঠতল**, বিপরীত দিককে বলে নিচের দিক বা **অঙ্কতল**। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহ **দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম**— অর্থাৎ এই ধরনের প্রাণীকে মেরুদণ্ড-বরাবর পিঠ থেকে



8 নং চিত্র— কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী : ক. চিতা ; খ. হংসচঞ্চু ; গ. তিমি ; ঘ. ক্যাঙারু ; ঙ. হনুমান।

পেটের দিকে কেটে, সমান দুভাগে ভাগ করা যায় ; অন্য কোনওভাবে কাটলে, দুভাগ সমান হয় না। বেশির ভাগ মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহ **লোম, পালক** কিংবা **আঁশ** দিয়ে ঢাকা থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর

দুজোড়া পা বা **পদ** থাকে। কতকগুলি মেরুদণ্ডী প্রাণীর, অবশ্য, একজোড়া **পদ** থাকে; আবার অনেক সময় পদ না-ও থাকতে পারে। লেজ-ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের একটা বিশেষত্ব।

যে সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে লোম এবং **স্তন্যগ্রন্থি** থাকে, তাদের বলা হয় **স্তন্যপায়ী প্রাণী**। এই দুটি লক্ষণ দেখে এদের সহজে চেনা যায়। এরা মায়ের দেহের ভিতর থেকে বাচ্চা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়; বাচ্চা স্তন্যগ্রন্থির দুধ পান করে পুষ্ট হয়। অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণীর **কর্ণছত্র** থাকে। এদের চোয়ালের গর্তে **দাঁত** থাকে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর আঙুলের ডগায় **নখ, নখর** অথবা **খুর** থাকে।

হংসচঞ্চু এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিন্তু, এরা বাচ্চা প্রসব করে না, পাখিদের মতো ডিম পাড়ে। ক্যাঙারু (Kangaroo) অপুষ্ট বাচ্চা প্রসব করে। স্ত্রী-ক্যাঙারু অপুষ্ট বাচ্চাকে পেটের নিচে অবস্থিত একটি থলির মধ্যে বয়ে বেড়ায়। স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও, বাদুড় ও চাম্‌চিকা পাখিদের মতো উড়তে পারে। মাছের মতো দেখতে তিমিও স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা সমুদ্রে বাস করে। নীল তিমি আকারে সবচেয়ে বড় প্রাণী। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে হাতি সবচেয়ে বড়। শজারু, ছুঁচা, বানর, হনুমান, বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, ইঁদুর, খরগোশ, গিনিপিগ (Guineapig) এবং গরু, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী। মানুষও স্তন্যপায়ী প্রাণী। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে মানুষের প্রধান পার্থক্য হল এই যে, মানুষ দুপায়ে খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে এবং ঐ অবস্থায় হাঁটতে ও দৌড়াতে পারে। এছাড়া, কথা বলা ও চিন্তা করার ক্ষমতা মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

লোম থাকলে যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণী চেনা যায়, তেমনি **পালক** থাকলেই পাখি বলে চেনা যায়। পাখি বা **পক্ষী**-ও মেরুদণ্ডী প্রাণী। পাখির দাঁত নেই। এদের চোয়াল শক্ত **ঠোঁট** বা **চঞ্চু** সৃষ্টি করে। চঞ্চু ও পায়ের নিচের দিকে কিছু অংশ ছাড়া, এদের দেহের প্রায় সমস্ত অংশ পালক দিয়ে ঢাকা। পায়ে যেখানে পালক নেই,

সেখানে আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। পাখিদের দুজোড়া পা থাকে না, একজোড়া ডানা ও একজোড়া পা থাকে। ডানার সাহায্যে এরা স্বচ্ছন্দে বায়ুতে উড়তে পারে। উটপাখি, এমু (Emu) প্রভৃতি পাখির ডানা খুব ছোট। এরা উড়তে পারে না। পেঙ্গুইন (Penguin) পাখি ডানার সাহায্যে জলে ভালো সাঁতার কাটতে



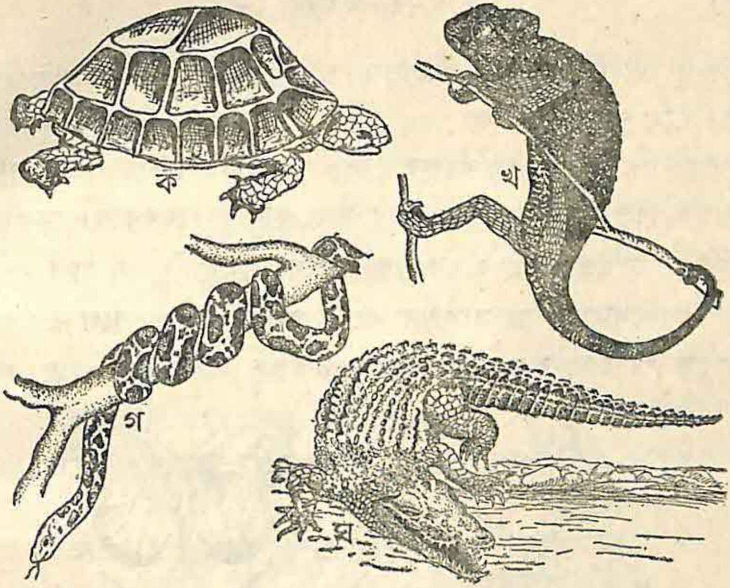
9 নং চিত্র— কয়েক রকম পাখি ঃ ক. শালিক ; খ. বক ; গ. বাবুই ; ঘ. শকুন ; ঙ. পেঁচা ; চ. টুনটুনি ; ছ. পেঙ্গুইন।

পারে। বক, কাক, চড়াই, শালিক, বুলবুল, বেনে-বৌ, বাবুই, সারস, পেঁচা, শকুন ও টুনটুনি ইত্যাদি পল্লী-অঞ্চলের পরিচিত পাখি। ঈগল, বাজ ইত্যাদি পাখি শিকার ধরতে পটু। ময়ূর দেখতে খুব সুন্দর। হাঁস-মুরগিও পাখি।

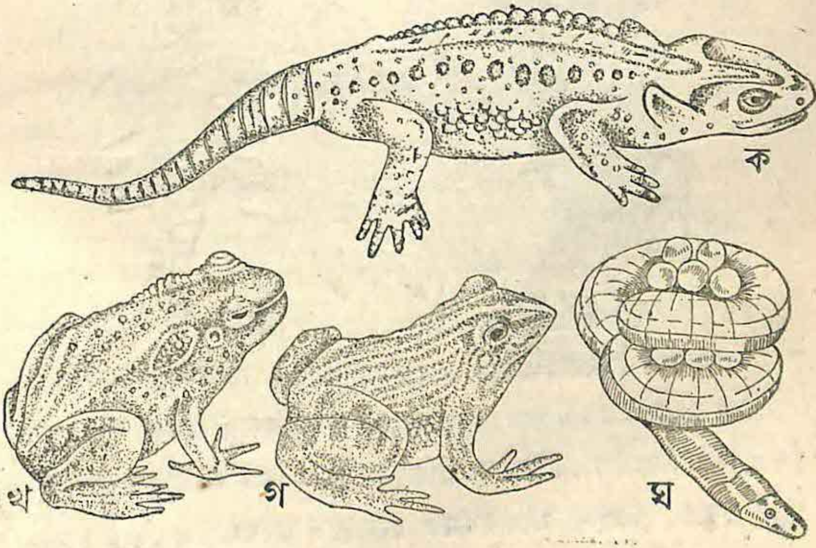
ডাঙায় বাস করে, কিন্তু দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা— এই ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম **সরীসৃপ**। কুমির, কচ্ছপ প্রভৃতি সরীসৃপ, অবশ্য, জলে বাস করে এবং আঁশের বদলে এদের দেহ শক্ত বর্ম দিয়ে ঢাকা। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো, সরীসৃপেরও দাঁত আছে ; কিন্তু এদের দাঁত চোয়ালের গায়ে লাগানো। এরা চিবিয়ে খেতে পারে না, গিলে খায়। এরা-ও ডিম পাড়ে। দুজোড়া পা থাকলেও, এরা সাধারণতঃ বুকে ভর দিয়ে চলে। সাপ সরীসৃপ ; কিন্তু, পা নেই। টিক্‌টিকি, বহুরূপী, গোসাপ প্রভৃতিও সরীসৃপ।

কতকগুলি মেরুদণ্ডী প্রাণী জীবনের প্রথমদিকে জলে এবং পরে ডাঙায় কাটায়। এরা **উভচর**। অবশ্য, এদের কেউ কেউ সারাজীবনই জলে কাটায়। উভচরের দেহে আঁশ, লোম অথবা পালক থাকে না। এদের একজোড়া সামনের পা ও একজোড়া পিছনের পা থাকে। এরা-ও ডিম পাড়ে। কোলা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, স্যালামাণ্ডার (Salamander), ইক্‌থিওফিস (*Ichthyophis*) প্রভৃতি উভচর প্রাণী। ইক্‌থিওফিস দেখতে কতকটা কেঁচোর মতো।

মৎস্য বা মাছেরা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। বেশির ভাগ মাছের সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। মাছেদের আঁশ চর্মের মধ্যে গেঁথে থাকে, সরীসৃপদের আঁশের মতো চর্মের ওপরে থাকে না। এদের পা নেই, তার বদলে দেহের নিচের দিকে দুজোড়া **পাখনা** থাকে। এছাড়া, সমস্ত মাছেরই **ফুলকা** থাকে। ফুলকা সাধারণতঃ কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে। কিন্তু হাঙর, শঙ্করমাছ প্রভৃতি মাছের **কানকো** থাকে না। এদের পাঁচ থেকে সাত জোড়া **ফুলকা-ছিদ্র** থাকে। মাছের মাথার পিছনদিক থেকে লেজ পর্যন্ত দেহের দুপাশে দুটি অস্পষ্ট রেখা দেখা যায়। এদের **পার্শ্বরেখা** বলে। শিঙি, মাগুর, ট্যাংরা, বোয়াল ইত্যাদি মাছের আঁশ থাকে না। ইলিশ, ভেট্‌কি, তপ্‌সে, পার্‌শে, ভাঙন ইত্যাদি মাছ নদীর মোহনার কাছে পাওয়া যায়। রুই, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি পোনা মাছের বসতি নদীর মিঠাজলে। তবে,



10 নং চিত্র— কয়েকটি সরীসৃপ : ক. কচ্ছপ ; খ বহুরূপী ;
গ. অজগর ; ঘ. কুমির।

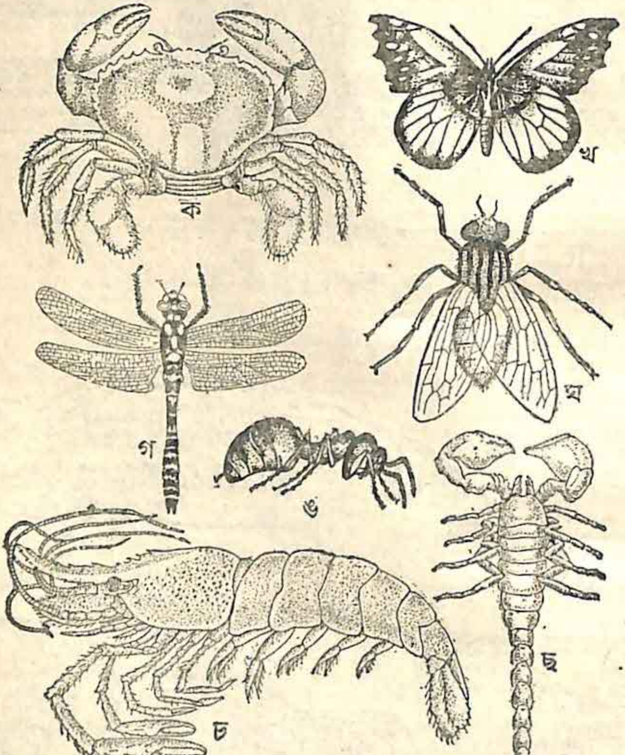


11 নং চিত্র— কয়েক রকম উভচর : ক. স্যালামাণ্ডার ; খ কুনো ব্যাঙ ;
গ. কোলা ব্যাঙ ; ঘ. ইক্‌থিওফিস।

পুকুরে এদের চাষ খুব প্রচলিত। কৈ, ল্যাঠা, শোল প্রভৃতি মাছ বদ্ধ জলে থাকে।

চিংড়ি, আরসোলা, কাঁকড়া-বিছা, মাকড়সা, কেন্নো, প্রজাপতি শামুক, ঝিনুক, জোঁক, কেঁচো, তারা-মাছ, কৃমি — এদের কারও মেরুদণ্ড নেই। সেইজন্য, এদের সকলকে **অমেরুদণ্ডী** প্রাণী বলা হয়।

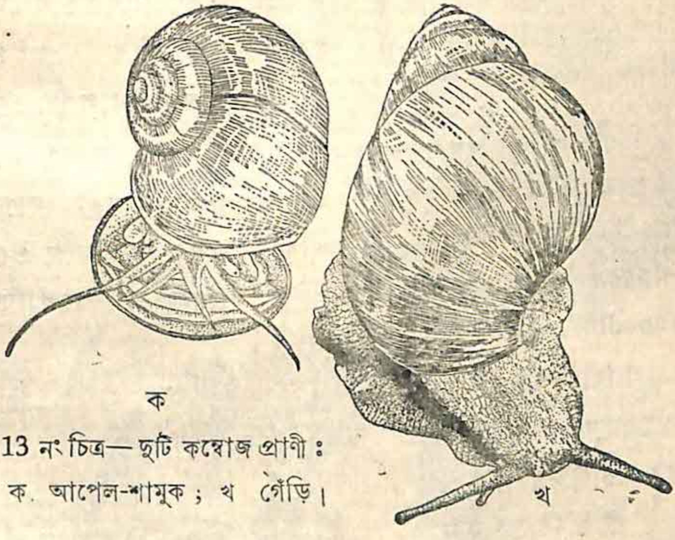
আরসোলা, বিছা, মাকড়সা এদের চলতি কথায় বলে পোকা-মাকড় ; বিজ্ঞানের ভাষায় এরা হল **সন্ধিপদ** প্রাণী। সংখ্যায় এরা



12 নং চিত্র— কয়েকটি সন্ধিপদ প্রাণী : ক. কাঁকড়া ; খ. প্রজাপতি ; গ. জল-ফড়িং ; ঘ. মাছি ; ঙ. পিঁপড়া ; চ. চিংড়ি ; ছ. কাঁকড়া-বিছা।

অগণিত। দেখতে নানারকম হলেও, এদের সকলের দেহ অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত এবং এদের সকলেরই দেহ থেকে সরু সরু উপাঙ্গ বের হয়। উপাঙ্গগুলি **সন্ধিল**, অর্থাৎ কতকগুলি খণ্ড

জুড়ে এক-একটি উপাঙ্গ তৈরী হয়। সেইজন্য এদের সন্ধিপদ প্রাণী বলা হয়। সন্ধিল উপাঙ্গ এবং খণ্ডিত দেহ দেখে এই গোষ্ঠীর প্রাণী চেনা যায়। সন্ধিপদ প্রাণীর দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এদের দেহে তিনটি প্রধান অংশ থাকে— মাথা বা **মস্তক**, বুক বা **বক্ষ** এবং পেট বা **উদর**। অনেক সময় মস্তক বা বক্ষ জুড়ে গিয়ে **শিরোবক্ষ** গঠিত হয়। **পুঞ্জাক্ষি** এদের আর একটা বিশেষত্ব। পুঞ্জাক্ষির গঠন মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পুঞ্জাক্ষির সাহায্যেও সন্ধিপদ প্রাণী চেনা যায়। উই, মৌমাছি, পিঁপড়া, নানাজাতের কাঁকড়া, চিংড়ি, রেশম-মথ,



ক

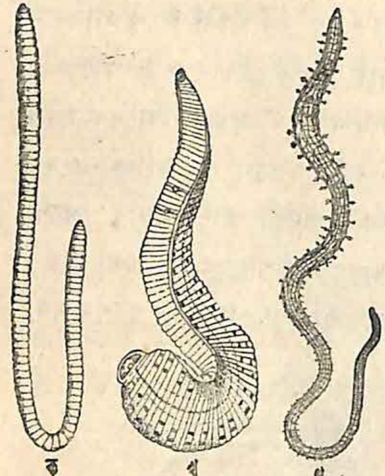
খ

13 নং চিত্র— দুটি কম্বোজ প্রাণী :
ক. আপেল-শামুক ; খ গেঁড়ি।

মশা, মাছি, আরসোলা, এঁটেল-পোকা, পঙ্গপাল, জল-ফড়িং, তেঁতুলে-বিছা, কাঁকড়া-বিছা, প্রজাপতি, কেন্নো— এরা সকলেই সন্ধিপদ প্রাণী।

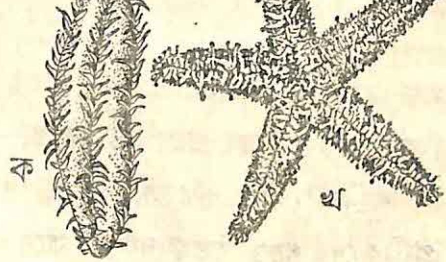
শামুক, গেঁড়ি, গুগ্‌লি, ঝিনুক, অক্টোপাস (*Octopus*) ইত্যাদি প্রাণীর দেহ খণ্ডে বিভক্ত নয়। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, এদের দেহ শক্ত খোলক-এর মধ্যে থাকে। অক্টোপাসের খোলক দেহের মধ্যে থাকে। এই গোষ্ঠীর প্রাণীদের নাম **কম্বোজ**। এরা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। কিন্তু, শামুক প্রভৃতি শম্বুক-জাতীয় কম্বোজ প্রাণীরা

অপ্রতিসম। কারণ, যেভাবেই কাটা হোক না কেন, এদের দেহ কখনই সমান দুভাগে ভাগ করা যায় না। কম্বোজ প্রাণীদের দেহের নিচের দিকে মাংসল পদ থাকে। বিভিন্ন কম্বোজ প্রাণীর পদ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়।



14 নং চিত্র— কয়েকটি অঙ্গুরীমাল প্রাণী : ক. কেঁচো ; খ. জোঁক ; গ. টিউবিফেক্স।

কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি আর এক ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী খুবই পরিচিত। এদেরও দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং আংটির মতো অনেকগুলি দেহ-খণ্ডক নিয়ে গঠিত। সেইজন্য, এদের নাম **অঙ্গুরীমাল**। এদের দেহ-খণ্ডকে সূক্ষ্ম সূচের মতো অসংখ্য **সিটা** (**Seta**) থাকে। আবার, অনেক অঙ্গুরীমাল প্রাণীর দেহ-খণ্ডকের দুপাশ থেকে ছোট ছোট মাংসল **প্যারাপোডিয়া** (**Parapodia**) বের হয়। সিটা, প্যারাপোডিয়া এবং দেহ-খণ্ডক দেখে অঙ্গুরীমাল গোষ্ঠীর প্রাণীদের চিনতে হয়। টি উ বি ফে ক্ স (*Tubifex*) এই ধরনের প্রাণী। এই প্রাণী শৌখিন পোষা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

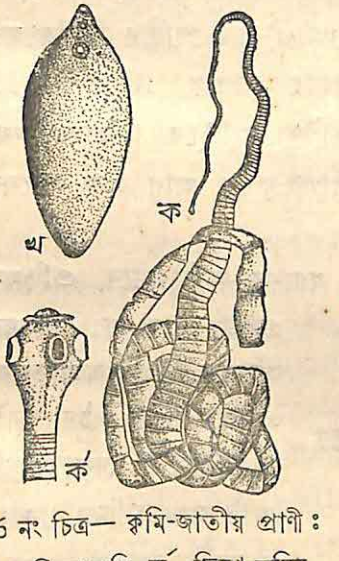


15 নং চিত্র— দুটি কণ্টকত্বক্ প্রাণী : ক. সমুদ্র-শসা ; খ. তারা-মাছ।

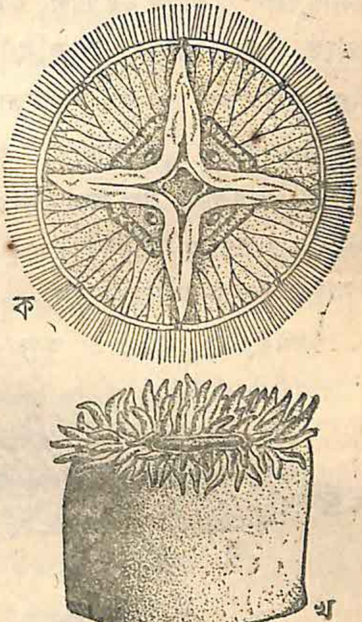
এপর্যন্ত আলোচিত প্রাণীদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। কিন্তু, আরও কয়েক ধরনের প্রাণী আছে, যাদের

দেহ **অরীয়ভাবে প্রতিসম**; অর্থাৎ, এদের মুখের মধ্য দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে যে-কোনও তলে কাটলে, সমান দুভাগ পাওয়া যাবে। তারা-মাছ ও সমুদ্র-শসা এই ধরনের প্রাণী। এদের চর্ম খুব খস্‌খসে এবং এতে ছোট ছোট শক্ত কাঁটা থাকে। সেইজন্য এদের **কণ্টকত্বক্‌ প্রাণী** বলে। এদের খুব ছোট ছোট নলের মতো পদ থাকে। পদের সাহায্যে এরা খুব আস্তে আস্তে চলতে পারে। সমস্ত কণ্টকত্বক্‌ প্রাণীই সমুদ্রের লোনাজলের বাসিন্দা।

কৃমিজাতীয় প্রাণীরা আর এক ধরনের দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম প্রাণী। এদের বেশির ভাগই উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীদের দেহের মধ্যে



16 নং চিত্র— কৃমি-জাতীয় প্রাণী: ক. ফিতা-কৃমি; ক´. ফিতা-কৃমির 'মাথা' (বড় করে দেখানো হয়েছে); খ. যকৃৎ-কৃমি।



17 নং চিত্র—একনালীদেহী প্রাণী: ক. জেলি-ফিশ; খ. সাগর-কুসুম।

স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং নানারকম রোগ ঘটায়। এদের অল্প কয়েকটি স্বাধীনজীবী। কৃমিরা দুরকমের— **চ্যাপ্টা কৃমি** এবং **গোল কৃমি**।

ফিতা-কৃমি ও যকৃৎ-কৃমি চ্যাপ্টা কৃমির উদাহরণ, আর কেঁচো-কৃমি, হুক(Hook)-কৃমি, কুচো কৃমি গোল কৃমির উদাহরণ। যকৃৎ-কৃমি কতকটা পাতার মতো দেখতে। এরা ভেড়ার পিত্তনালীতে বাস করে। ফিতা-কৃমি দেখতে ফিতার মতো। এই কৃমি মানুষের অন্ত্রে বাস করে। কেঁচো-কৃমি, হুক-কৃমি এবং কুচো কৃমি মানুষের অন্ত্রে থাকে। এরা মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

জেলি-ফিশ (Jelly-fish) আর এক ধরনের অরীয়ভাবে প্রতিসম প্রাণী। এদের দেহ কতকটা ছাতার মতো; দেহের এক প্রান্তে একটি ছোট গর্ত এদের মুখ; মুখের চারপাশ থেকে সরু সরু আঙুলের মতো অনেকগুলি কর্ষিকা ঝুলে থাকে। এরা সমুদ্রের জলে ভেসে থাকে। জেলি-ফিশ যে গোষ্ঠীর প্রাণী, তার নাম একনালীদেহী প্রাণী। হাইড্রা (*Hydra*) এই গোষ্ঠীর মিঠাজলের প্রাণী। জলে, সাধারণতঃ খুদিপানার পাতায়, 10 থেকে 15 মিলিমিটার লম্বা, সরু সরু নলাকার হাইড্রা আটকে থাকতে দেখা যায়। এদেরও কর্ষিকা থাকে। সাগর-কুসুম আর এক ধরনের সামুদ্রিক একনালীদেহী প্রাণী।

স্পঞ্জ (Sponges)-ও আর এক ধরনের অরীয়ভাবে প্রতিসম প্রাণী। অবশ্য, এদের অনেকে আবার অপ্রতিসম। এদের দেহের গঠন খুবই সাদাসিধে। দেহে ছোট ছোট অসংখ্য ছিদ্র থাকায়, এদের ছিদ্রাল প্রাণী বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের দেহে উদ্ভিদের মতো শাখা-প্রশাখা থাকে। এই গোষ্ঠীর বেশির ভাগ প্রাণীকে সমুদ্রে দেখা যায়। কেবল স্পঞ্জীলা (*Spongilla*) নামে এক



18 নং চিত্র— ছিদ্রাল প্রাণী:
ক. স্পঞ্জীলা; খ. বাথ-স্পঞ্জ।

ধরনের স্পঞ্জ্ পুকুরের মিঠাজলে পাওয়া যায়। স্নানের সময় ব্যবহৃত বাথ স্পঞ্জ্ (Bath sponge)-ও একরকম ছিদ্রালী প্রাণী।

এছাড়া আরও এক ধরনের প্রাণী আছে, যারা সবাই এককোষী। এককোষী প্রাণীদের খালি চোখে দেখা যায় না। এই প্রাণীদের নিয়ে যে গোষ্ঠী, তার নাম আদ্যপ্রাণী। এদের কেউ কেউ অন্য প্রাণীর দেহে বাস করে এবং রোগ সৃষ্টি করে। এককোষী প্রাণীরাই আমাশয়, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের কারণ। এই ধরনের প্রাণীরা ভিজা মাটিতে, মিঠাজলে অথবা সমুদ্রে বাস করে। এদের দেহ গোল, লম্বাটে অথবা নির্দিষ্ট আকার-বিহীন। অ্যামিবা (*Amoeba*), প্যারামিসিয়াম (*Paramecium*) ইত্যাদি এককোষী প্রাণী।

এই পরিচ্ছেদের শেষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ছকের আকারে দেখানো হল।

অনুশীলনী

1. কি কি লক্ষণ দেখে সপুষ্পক উদ্ভিদ চিনবে, তা লেখ। তোমার দেখা কয়েকটি সপুষ্পক উদ্ভিদের নাম কর।

2. বাইরে থেকে দেখে, কি করে একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ চিনবে? পাঁচটি একবীজপত্রী উদ্ভিদের নাম লেখ।

3. যেসব উদ্ভিদে পুষ্প হয় না, তারা কি সকলেই এক গোষ্ঠীর অন্তর্গত? পুষ্প হয় না এমন তিন ধরনের তিনটি উদ্ভিদের নাম কর।

4. বাইরে থেকে দেখে, কি করে পরিণত মস ও ফার্ণ চিনবে?

5. সমাঙ্গদেহ কাকে বলে? শেওলা ও ছত্রাকের লক্ষণ কি?

6. স্তন্যপায়ী প্রাণী চিনবে কি করে? যে সমস্ত লক্ষণ দেখে স্তন্যপায়ী প্রাণী চেনা যায়, একটি প্রাণীর ছবি এঁকে সেগুলি চিহ্নিত কর।

7. যে সমস্ত লক্ষণ দেখে পাখি চেনা যায়, তা লেখ। পাখির ছবি এঁকে ঐ লক্ষণগুলি চিহ্নিত কর। পাঁচটি পাখির নাম লেখ।

8. বাইরে থেকে দেখে কিভাবে সরীসৃপ ও উভচর আলাদা করা যায়? চারটি সরীসৃপ ও চারটি উভচরের নাম লেখ।

9. মাছের বিশেষত্ব কি ? কয়েকটি মাছের নাম লেখ।

10. কি কি লক্ষণ দেখে সন্ধিপদ প্রাণী চেনা যায়? পাঁচটি সন্ধিপদ প্রাণীর নাম লেখ।

11. কেঁচো কোন্ গোষ্ঠীর প্রাণী ? ঐ গোষ্ঠীর প্রাণীর লক্ষণ কি ?

12. নিচের প্রাণীগুলি কোন্ গোষ্ঠীর ?

হাতি, কৈ, মাকড়সা, জোঁক, চিল, কুনো ব্যাঙ, মানুষ, কাঁকড়া, তারা-মাছ, ফিতা-কৃমি, গোসাপ, জেলি-ফিশ, গুগ্‌লি, সিংহ, হাঙর, চিংড়ি।

13. নিচের বক্তব্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে **হ্যাঁ**, এবং যেটি ভুল তার পাশে **না** লেখ :—

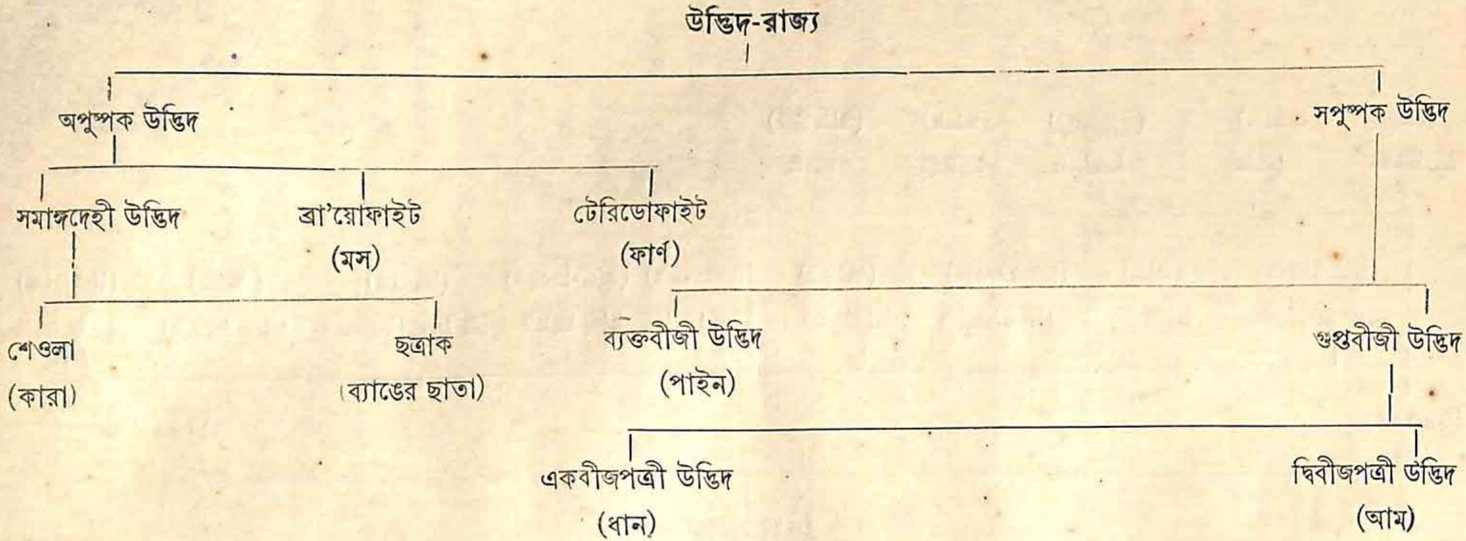
(ক) ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের বীজ ফলের মধ্যে ঢাকা থাকে। (খ) ধান একবীজপত্রী উদ্ভিদ। (গ) সপুষ্পক উদ্ভিদের দেহকে সমাঙ্গদেহ বলে। (ঘ) সাধারণতঃ যে সমস্ত উদ্ভিদে শাখা-প্রশাখা থাকে, সেগুলি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। (ঙ) পত্রে রেণুস্থলী থাকলে, তাদের ফার্ণ বলা যায়। (চ) মসের কচি পত্র কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। (ছ) শেওলা সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ। (জ) ছত্রাকের রঙ সাধারণতঃ সবুজ। (ঝ) বেশির ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। (ঞ) পাখির দেহ সাধারণতঃ লোম দিয়ে ঢাকা। (ট) বেশির ভাগ মাছের দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা। (ঠ) সরীসৃপের কানকো থাকে। (ড) সন্ধিল উপাঙ্গ দেখে সন্ধিপদ প্রাণী চেনা যায়। (ঢ) কম্বোজ প্রাণীর পুঞ্জাক্ষি থাকে। (ণ) তারা-মাছের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। (ত) কেঁচো ও জোঁক, কৃমি-জাতীয় প্রাণী। (থ) আদ্যপ্রাণীর দেহের আয়তন বেশ বড়।

14. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) গুপ্তবীজী উদ্ভিদ দুরকমের, — ও —। (খ) ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কেবল — ও — হয়, — হয় না। (গ) মসের কাণ্ড, পত্র ও — থাকে। (ঘ) শেওলার দেহ —, ও — আলাদা করা যায় না। (ঙ) — না থাকায় ছত্রাকের রঙ —। (চ) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের — থাকে। (ছ) পাখির মাথার সামনের দিকে — থাকে, — তে — থাকে না। (জ) সমস্ত মাছের — থাকে। (ঝ) কেঁচো — গোষ্ঠীর প্রাণী। (ঞ) সমস্ত সন্ধিপদ প্রাণীর দেহে — — থাকে।

প্রাণিরাজ্য

- অমেরুদণ্ডী
  - আদ্য প্রাণী (অ্যামিবা)
  - ছিদ্রাল প্রাণী (স্পঞ্জ)
  - একনালীদেহী প্রাণী (হাইড্রা)
  - গোল কৃমি (কেঁচো-কৃমি)
  - চ্যাপ্টা কৃমি (যকৃৎ-কৃমি)
  - অঙ্গুরীমাল (কেঁচো)
  - সন্ধিপদ প্রাণী (আরসোলা)
  - কম্বোজ (শামুক)
  - কণ্টকত্বক্ প্রাণী (তারা-মাছ)
- মেরুদণ্ডী
  - মৎস্য (রুই মাছ)
  - উভচর (ব্যাঙ)
  - সরীসৃপ (টিকটিকি)
  - পক্ষী (পায়রা)
  - স্তন্যপায়ী (ইঁদুর)


উদ্ভিদ-রাজ্য
অপুষ্পক উদ্ভিদ
সপুষ্পক উদ্ভিদ
সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ
ব্রা'য়োফাইট
(মস)
টেরিডোফাইট
(ফার্ণ)
শেওলা
(কারা)
ছত্রাক
(ব্যাঙের ছাতা)
ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ
(পাইন)
গুপ্তবীজী উদ্ভিদ
একবীজপত্রী উদ্ভিদ
(ধান)
দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ
(আম)

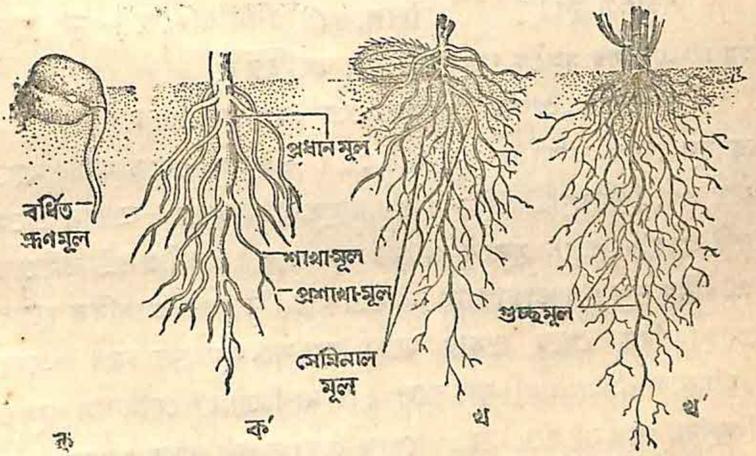
বাহ্য গঠন

2

এই পরিচ্ছেদে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং কয়েকটি প্রাণীর বাহ্য গঠন আলোচনা করা হল।

উদ্ভিদের বাহ্য গঠন ঃ নিচে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের বাহ্য গঠন বর্ণনা করা হল।

মূল ঃ মূল সাধারণতঃ মাটির নিচে থাকায়, আলো পায় না। মূলে ক্লোরোফিল থাকে না। ফলে, অধিকাংশ মূল সাদাটে হয়। কাণ্ডে যেমন গাঁট বা পর্ব থাকে, মূলে সেরকম থাকে না। মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ শোষণ করা এবং মাটির সঙ্গে উদ্ভিদকে আঁকড়ে রাখা মূলের প্রধান কাজ।



19 নং চিত্র— প্রধান মূল ও গুচ্ছমূল ঃ ক বর্ধিত ভ্রূণমূল ; ক'. প্রধান মূল-তন্ত্র ; খ. সেমিনাল মূল ; খ'. গুচ্ছমূল।

মূল প্রধানতঃ দুরকমের— প্রধান মূল এবং গুচ্ছমূল। সমস্ত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলের প্রধান অক্ষকে প্রধান মূল বলে। মাটির মধ্যে কাণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে প্রধান মূল বের হয় এবং ডগার দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে শেষ হয়। প্রধান মূলের

চারদিক থেকে যে সব সরু সরু মূল বের হয় তাদের শাখা-মূল বলে। শাখা-মূল থেকে একইভাবে অনেক সরু প্রশাখা-মূল বের হয়। প্রধান মূল, শাখা-মূল ও প্রশাখা-মূল—সব মিলিয়ে উদ্ভিদের প্রধান মূল-তন্ত্র তৈরী হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল থাকে না। এদের কাণ্ডের মাটির কাছাকাছি পর্ব থেকে অসংখ্য সরু মূল বের হয়। এদের বলে গুচ্ছমূল। উদ্ভিদ যতদিন বাঁচে, গুচ্ছমূলও ততদিন থাকে। গুচ্ছমূল প্রধান মূলের মতোই কাজ করে।



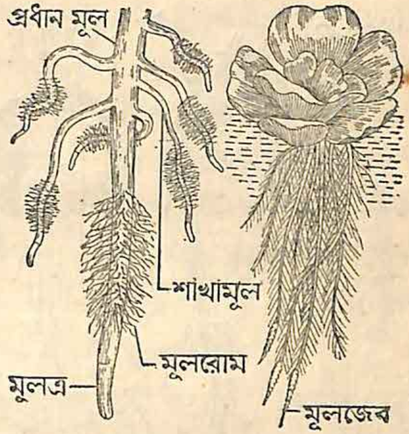
20 নং চিত্র — পাথরকুচির পত্রাশয়ী মূল।

অনেক উদ্ভিদের পত্র থেকেও মূল বের হতে পারে। যেমন— পাথরকুচির পাতা কয়েকদিন ভিজে মাটিতে রেখে দিলে, এর কিনারা থেকে মূল বের হয়। এই সব মূলকে পত্রাশয়ী মূল বলা হয়।

বীজ থেকে প্রথমে যে মূল বের হয়, তাকে বলে ভ্রূণমূল। ভ্রূণমূল থেকে প্রাথমিক মূল সৃষ্টি হয়। এই মূল বেড়ে মাটির মধ্যে যায় এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল গঠন করে। ভ্রূণমূল থেকে সৃষ্টি হওয়ায়, প্রধান মূলকে স্থানিক মূল বলে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রাথমিক মূল খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তারপর প্রাথমিক মূলের গোড়ার দিক থেকে সূতার মতো সরু সরু মূল বের হয়। এদের সেমিনাল (Seminal) মূল বলে (19 নং চিত্র)। সেমিনাল মূলও কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়। শেষে কাণ্ডের পর্ব থেকে গুচ্ছমূল বের হয়। ভ্রূণমূল থেকে সৃষ্টি হয় না বলে, এই মূলকে অস্থানিক মূল বলে। ভ্রূণমূল ছাড়া উদ্ভিদের অন্য যে-কোনও অংশ থেকে মূল বের হলেই, সেই মূলকে অস্থানিক মূল বলে। কাজেই, গুচ্ছমূল ও পত্রাশয়ী মূল অস্থানিক মূল।

মূলের বিভিন্ন অংশ : স্থানিক মূলে প্রধান মূল, শাখা-মূল ও প্রশাখা-মূল থাকে; কিন্তু অস্থানিক মূলে থাকে না। মূলের

আরও কতকগুলি অংশ আছে। সেগুলি স্থানিক এবং অস্থানিক এই দুধরনের মূলেই দেখা যায়। মূলের ডগায় টুপির মতো একটি অংশ থাকে। এর নাম মূলত্র। কচুরিপানা, বড় পানা প্রভৃতি যে সব উদ্ভিদ জলের উপর ভেসে থাকে, তাদের মূলের ডগায় মূলত্রের বদলে চোঙার মতো মূলজেব থাকে। মূলত্র অথবা মূলজেব মূলের কোমল ডগাকে ঢেকে রাখে এবং আঘাত থেকে রক্ষা করে। মূলের যে অঞ্চলে মূলত্র থাকে, তাকে মূলত্র-অঞ্চল বলে। মূলত্রের কিছু উপরে, মূলের চারপাশ থেকে সরু সরু রোঁয়া বের হয়। এই রোঁয়াগুলিকে বলে মূলরোম। মূলরোমই জল শোষণ করে। মূলরোম না থাকায়, জলে ভাসমান উদ্ভিদ সমগ্র মূল দিয়ে জল শোষণ করে। মূলের যে অঞ্চলে মূলরোম থাকে, তাকে মূলরোম-অঞ্চল বলে। মূলত্র-অঞ্চল এবং মূলরোম-অঞ্চলের মাঝের অংশকে মূলের বর্ধমান-অঞ্চল বলে। মূলরোম অঞ্চলের কিছু উপর থেকে শাখা-মূল, এবং শাখা-মূল থেকে প্রশাখা-মূল বের হয়। মূলের যে অঞ্চল থেকে শাখা-মূল বের হয়, তাকে স্থায়ী অঞ্চল বলা হয়।

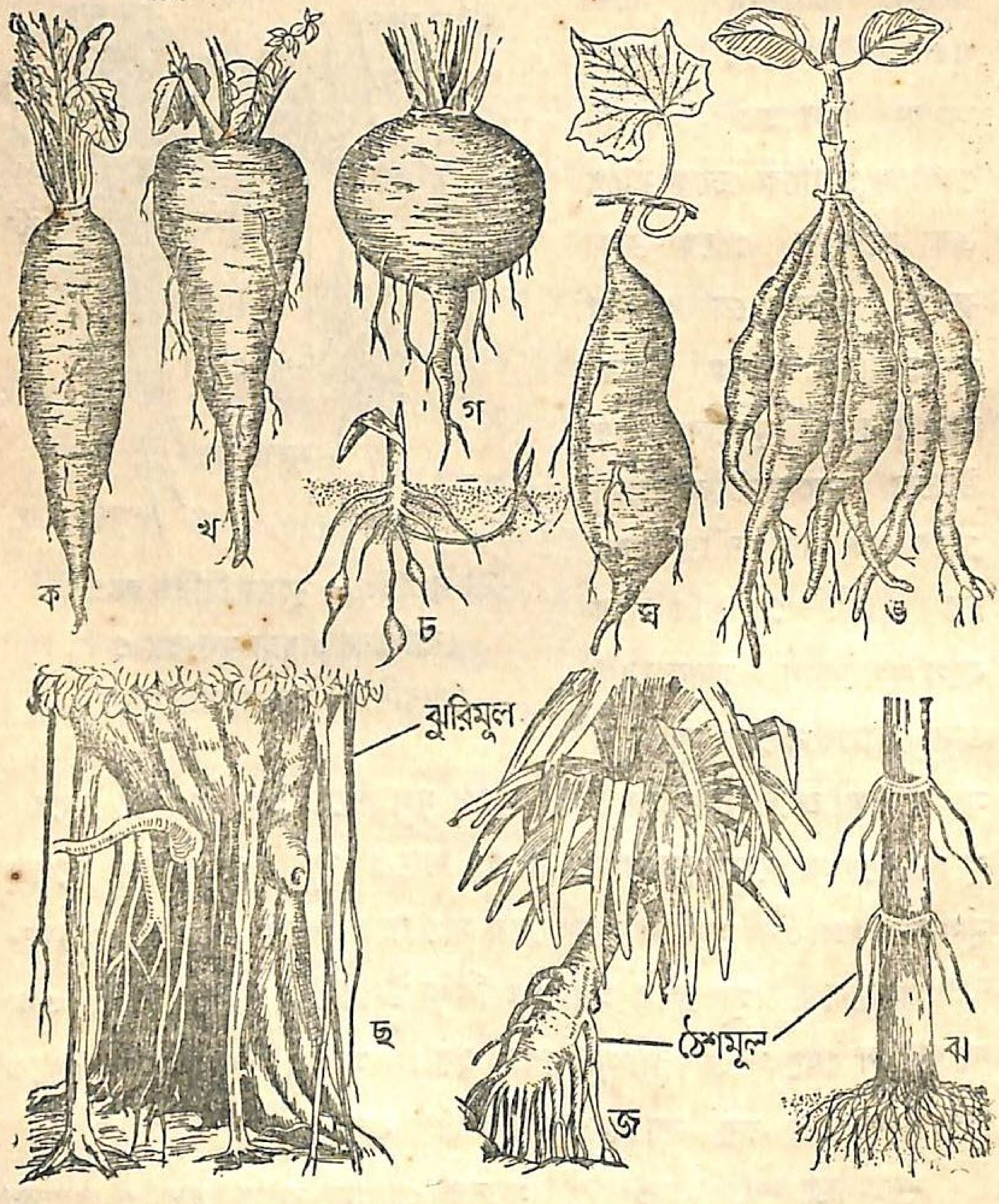


21 নং চিত্র— মূলের বিভিন্ন অংশ : (বাঁদিকে) প্রধান মূল-তন্ত্র ও (ডানদিকে) বড় পানার মূল।

মূলের পরিবর্তন : মূলের প্রধান কাজ জল ও লবণের দ্রবণ শোষণ করা এবং উদ্ভিদকে মাটির সঙ্গে আঁকড়ে রাখা। কিন্তু অনেক সময় মূলকে আরও কতকগুলি বিশেষ কাজ করতে হয়। এজন্য মূলের নানারকম পরিবর্তন হয়।

কখনও কখনও মূলের পরিবর্তন এত বেশি হয় যে, এদের

মূল বলে সহজে চেনা যায় না। স্থানিক এবং অস্থানিক দুরকম মূলই পরিবর্তিত হয়। যেমন— মুলা, গাজর, শালগম— এরা এক ধরনের পরিবর্তিত স্থানিক মূল। খাদ্য জমা থাকায়, এরা বেশ মোটা হয়। এদের ভাণ্ডার মূল বলে।



22 নং চিত্র— মূলের নানারকম পরিবর্তন : ক. মুলা ; খ. গাজর ; গ. শালগম ; ঘ. রাঙা-আলু ; ঙ. ডালিয়া ; চ. মুথাঘাস ; ছ. বট ; জ. কেয়া ; ঝ. আখ।

এদের আকার ও গঠন নানা রকমের ; যেমন— মুলা দুদিকে সরু, মাঝখানে মোটা। এইরকম মূলকে মূলকাকার মূল বলে। গাজর

উপরের দিকে সবচেয়ে মোটা, নিচের দিকে ক্রমশঃ সরু এবং কতকটা শঙ্কুর মতো দেখতে। এই ধরনের মূলকে শাঙ্কব মূল বলে। আবার শালগম, বীট ইত্যাদি উপরের দিকে গোল ও মোটা, নিচের দিকে হঠাৎ সরু। এই রকম মূলকে **শালগমাকার মূল** বলে।

অনেক অস্থানিক মূলও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং মোটা হয়। যেমন— রাঙা-আলু। এই রকম মূলকে **কন্দাল মূল** বলে। কন্দাল মূলের আকার নির্দিষ্ট নয়। ডালিয়া (*Dahlia*); শতমূলী ইত্যাদির কাণ্ডের সবচেয়ে নিচের পর্ব থেকে উৎপন্ন অনেকগুলি অস্থানিক মূল খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে মোটা হয়। এইরকম মূলকে **গুচ্ছিত মূল** বলে। মুথাঘাসের সরু সরু অস্থানিক মূল শুধু ডগার দিকে মোটা হয়। এই ধরনের মূলকে **অর্বুদযুক্ত মূল** বলে। খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে স্থানিক ও অস্থানিক মূলের এছাড়া আরও অনেক পরিবর্তন হয়।

খাদ্য সঞ্চয় করা ছাড়া, আরও নানা কারণে অস্থানিক মূলের পরিবর্তন হয়। বট ও অশ্বত্থের ঝুরি এইরকম এক ধরনের পরিবর্তিত মূল। এই মূলগুলি কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা থেকে বেরিয়ে প্রথমে বেশ কিছুদিন ঝুলে থাকে। ক্রমে এরা মোটা হতে থাকে এবং শেষে খাড়াভাবে মাটিতে নেমে আসে। তখন এদের থামের মতো দেখায়। এই ধরনের মূলকে **স্তম্ভমূল** বা **ঝুরিমূল** বলে।

আখ, বাঁশ, কেয়া প্রভৃতির কাণ্ডের নিচের দিকের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বেরিয়ে বাঁকাভাবে মাটির ভিতরে ঢুকে যায়। এই মূলগুলি গুচ্ছমূলের চেয়ে বেশ মোটা ও শক্ত। এদের বলে ঠেশমূল। ঠেশমূল এবং ঝুরিমূলের কাজ যথাক্রমে মাটির সঙ্গে কাণ্ডকে বেশি শক্ত করে ধরে রাখা, ও শাখা-প্রশাখার ভার বহন করা। এছাড়া, আরও নানাভাবে মূলের পরিবর্তন হয়ে থাকে।

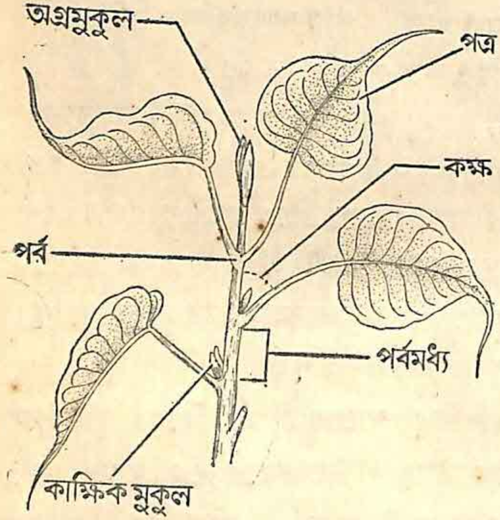
কাণ্ড ঃ মাটির উপর উদ্ভিদের প্রধান অক্ষকে কাণ্ড বলে। কাণ্ডে শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন কাণ্ডের আকার ও উচ্চতা বিভিন্ন। দেবদারু ও ইউ-ক্যালিপ্‌টাস(*Eucalyptus*)-এর কাণ্ড প্রায় 100 থেকে 150

মিটার লম্বা। খুদিপানার কাণ্ড খুব ছোট। পুঁই, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির কাণ্ড সরু এবং মাটির উপর লতিয়ে, অথবা মাচা বা কোনও খাড়া অবলম্বনকে জড়িয়ে বাড়ে। কিন্তু বেশির ভাগ কাণ্ডই মাটির উপর খাড়া হয়ে থাকে।

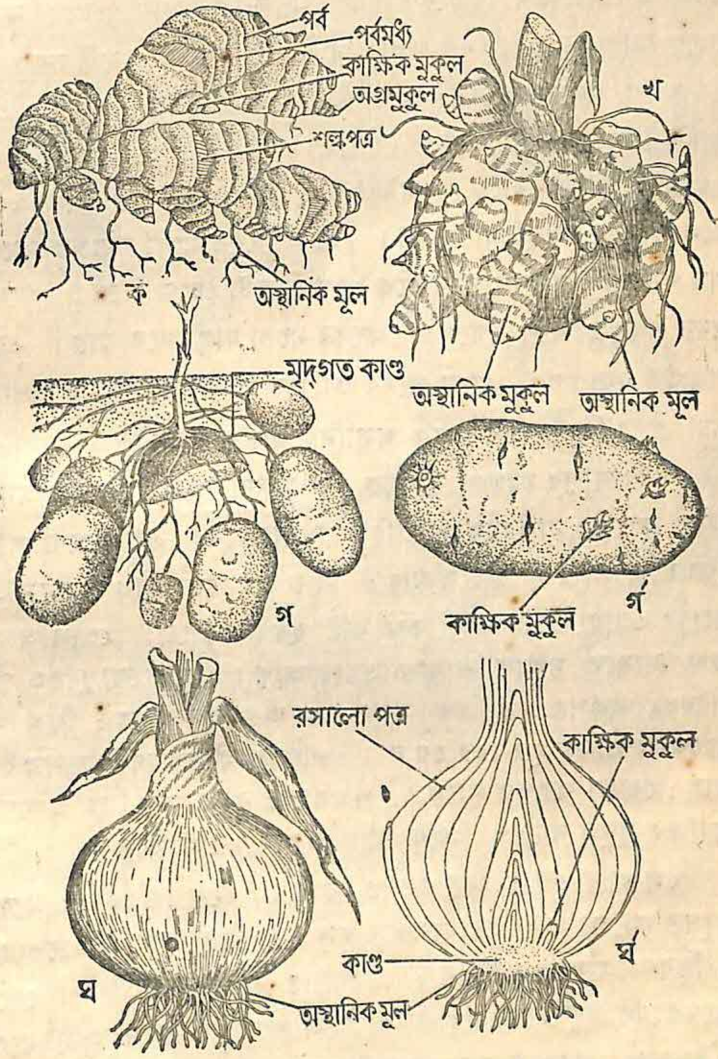
শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ইত্যাদির ভার বহন করা কাণ্ডের প্রধান কাজ। মূল যে জল ও অজৈব লবণের দ্রবণ শোষণ করে, সেগুলি পত্রে পোঁছে দেওয়া, এবং পত্রে যে খাদ্য তৈরী হয় সেগুলি বিভিন্ন অঙ্গে পোঁছে দেওয়া কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার আর এক প্রধান কাজ।

কাণ্ডের বিভিন্ন অংশঃ কাণ্ডের কতকগুলি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পত্র বের হয়। যেখান থেকে পত্র বের হয়, সেই জায়গা গাঁটের মতো। ঐ অংশের নাম **পর্ব**। পর পর দুটি পর্বের মাঝখানের অংশটি **পর্বমধ্য**। পর্ব ও পর্বমধ্য দেখে কাণ্ড চেনা যায়। পর্বে পত্র ও কাণ্ড যে সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে, তাকে কক্ষ বলে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের কক্ষে কুঁড়ি বা মুকুল থাকে। একে বলে কাক্ষিক মুকুল। কাণ্ডের কাক্ষিক মুকুল থেকে শাখা এবং শাখার কাক্ষিক মুকুল থেকে প্রশাখা বের হয়। কাণ্ডের ডগাতে যে মুকুল থাকে, তাকে অগ্রমুকুল বা শীর্ষমুকুল বলে। অগ্রমুকুলের বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদ লম্বায় বাড়ে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে সাধারণতঃ কাক্ষিক মুকুল থাকে না, কেবল অগ্রমুকুল থাকে। সেইজন্য এদের শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয় না। এরা কেবল লম্বায় বাড়ে।



23 নং চিত্র—কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ।

কাণ্ডের পরিবর্তন ঃ বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য, কাণ্ডের নানারকম পরিবর্তন হয়। নিচে কাণ্ডের এইরকম কতকগুলি পরিবর্তন আলোচনা করা হল।



24 নং চিত্র— কাণ্ডের পরিবর্তন (মৃদ্‌গত) ঃ ক. আদা ; খ. ওল ; গ. ও গ´ গোল-আলু ; ঘ. সম্পূর্ণ পিঁয়াজ ; ঘ´ লম্বালম্বি কাটা পিঁয়াজ।

আদা, মানকচু, গোল-আলু, ওল ইত্যাদির যে অংশ মানুষের

খাদ্য, সেগুলি আসলে কাণ্ড কিংবা কাণ্ডের অংশ। কাণ্ড হলেও, এরা মাটির নিচে থাকে। এই ধরনের কাণ্ডকে মৃদ্‌গত কাণ্ড বলে। খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এদের কাজ। প্রতিকূল অবস্থায় এদের মাটির উপরের অংশ নষ্ট হয়ে যায়। অনুকূল অবস্থায় মৃদ্‌গত কাণ্ড থেকে আবার বায়ব বিটপ অর্থাৎ, মাটির উপরের কাণ্ড সৃষ্টি হয়।

আদা, হলুদ, প্রভৃতির মৃদ্‌গত কাণ্ডকে গ্রন্থিকাণ্ড বলে। এরা মাটির নিচে অনুভূমিকভাবে (অর্থাৎ, মাটির উপরের তলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে) বাড়ে। স্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য থাকায়, এদের কাণ্ড বলে চিনতে অসুবিধা হয় না। পর্বে আঁশের মতো শল্কপত্র নামের পত্র থাকে। শল্কপত্র পর্বমধ্যকে বেশ কিছুটা ঢেকে রাখে। অনেক সময় শল্কপত্র খসে গেলেও, ক্ষতের মতো দাগ থেকে যায়। একে পত্রক্ষত বলা হয়। এদের পর্বের কাক্ষিক মুকুল থেকে শাখা-প্রশাখা, এবং পর্বের নিচের দিক থেকে অস্থানিক মূল বের হয়।

গোল-আলুর মৃদ্‌গত কাণ্ডকে স্ফীতকন্দ বলে। গোল-আলুর বায়ব কাণ্ডের মাটির কাছাকাছি পর্ব থেকে সরু এক ধরনের শাখা বের হয়ে, মাটির নিচে চলে যায়। খাদ্য জমা হতে থাকায় ক্রমে এই শাখার ডগায় ডিমের মতো কন্দ সৃষ্টি হয়। কাজেই, গোল-আলুর কন্দ আসলে মৃদ্‌গত শাখার ডগার অংশ। গোল আলুতেও পর্ব, পর্বমধ্য, শল্কপত্র, কাক্ষিক মুকুল এবং অগ্রমুকুল থাকে ; কিন্তু পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয় না। পরিণত স্ফীতকন্দের শল্কপত্র ঝরে যায় ; কেবল পত্রক্ষত থাকে। পত্রক্ষতের কক্ষে, অল্প নিচু জায়গায় কাক্ষিক মুকুল থাকে। একে গোল-আলুর 'চোখ' বলে।

ওল আর এক ধরনের মৃদ্‌গত কাণ্ড। একে গুঁড়িকন্দ বলে। মৃদ্‌গত কাণ্ডের মধ্যে এরা সবচেয়ে বড় এবং গোলাকার। প্রত্যেকটি গুঁড়িকন্দ আসলে এক একটি পরিবর্তিত পর্বমধ্য। পর্বমধ্য থেকে অনেকগুলি মুকুল বের হয়।* একে চলতি কথায় ওলের 'মুখী' বলে। গুঁড়িকন্দের চারপাশ থেকে অস্থানিক মূল বের হয়।

---

* মুকুল সাধারণতঃ পর্বের কক্ষে থাকে। পর্ব থেকে উৎপন্ন হওয়ায়, এই মুকুলগুলি অস্থানিক মুকুল।

পিঁয়াজ ও রসুন আর এক ধরনের পরিবর্তিত মৃদ্‌গত কাণ্ড। এদের কন্দ বলে। এদের কাণ্ড খুবই চ্যাপ্টা, দেখতে উত্তল চাক্‌তির মতো এবং মাটির নিচে খাড়াভাবে থাকে। কাণ্ডে পর্বমধ্য এত কাছাকাছি থাকে যে, পর্বমধ্য আছে বলে মনে হয় না। পর্ব থেকে



25 নং চিত্র— কাণ্ডের পরিবর্তন (অর্ধ-বায়ব ও বায়ব): ক. খাম-আলু; খ. ঝুমকালতা; গ. মেহেদি; ঘ. আমরুল; ঙ. কচুরিপানা; চ. ফণিমনসা।

পুরু ও রসালো পত্র বেরিয়ে কাণ্ডকে ঘিরে রাখে। এই রসালো পত্র মানুষের খাদ্য। উত্তল চাক্‌তির মাঝখানে অগ্রমুকুল এবং পত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল থাকে। কাণ্ডের নিচে অসংখ্য গুচ্ছমূল জন্মায়।

আমরুল দূর্বা ঘাস, কচুরিপানা, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি এক বিশেষ

ধরনের শাখার সাহায্যে বংশবিস্তার করে। শাখাগুলি মাটি-সংলগ্ন কাণ্ডের নিচের দিকের পর্ব থেকে জন্মায় এবং মাটির ঠিক উপরে কিংবা অল্প নিচে (কচুরিপানার ক্ষেত্রে, জলের উপরে অথবা জলের অল্প নিচে) বাড়তে থাকে। এদের বলে **অর্ধ-বায়ব কাণ্ড**। এইরকম শাখার পর্ব থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে, উপরের দিকে নূতন বায়ব বিটপ এবং নিচের দিকে অস্থানিক মূল বের হয়। এইভাবে প্রধান উদ্ভিদ থেকে কিছুদূরে একটি করে উদ্ভিদ জন্মায়। ক্রমে পর্বমধ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন প্রত্যেকটি উদ্ভিদ স্বাধীনভাবে বাড়ে এবং একইভাবে আবার বংশবিস্তার করে। মৃদ্‌গত এবং অর্ধ-বায়ব কাণ্ডের সাহায্যে উদ্ভিদেরা **অঙ্গজ বিস্তার** নামের বিশেষ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

এ পর্যন্ত যে সব পরিবর্তিত কাণ্ড আলোচনা করা হল, তাদের প্রত্যেকেরই পর্ব এবং পর্বমধ্য থাকায়, কাণ্ড বলে চিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সময় সময় কাণ্ড এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তখন কাণ্ড বলে সহজে চেনা যায় না। যেমন—

মেহেদি গাছের কাণ্ডের কাক্ষিক মুকুল সাধারণ শাখার বদলে সূচালো কাঁটায় পরিবর্তিত হয়। এদের **শাখা-কণ্টক** বলে।

ঝুম্‌কালতা, হাড়জোড়া প্রভৃতির আকর্ষ এক ধরনের পরিবর্তিত কাণ্ড। এদের **শাখা-আকর্ষ** বলে। কাক্ষিক মুকুল পরিবর্তিত হয়ে এই আকর্ষ সৃষ্টি করে। আকর্ষে পর্ব না থাকায়, কাণ্ড বলে সহজে চেনা যায় না। তবে অনেক সময় আকর্ষের গায়ে ছোট শল্কপত্র থাকে। আঙুর গাছের অগ্রমুকুলও আকর্ষে পরিবর্তিত হয়।

অনেক সময় কাক্ষিক মুকুল এক বিশেষ ধরনের অঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এইরকম অঙ্গকে বাল্‌বিল (Bulbil) বলে। বাল্‌বিল গোল এবং মোটা। পরিণত বাল্‌বিল মাটিতে পড়ে নূতন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। খাম-আলু গাছে এই ধরনের বাল্‌বিল দেখা যায়।

ফণিমনসার কাণ্ড চ্যাপ্টা, রসালো এবং সবুজ। এই ধরনের কাণ্ডকে **পর্ণকাণ্ড** বলে। এই কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য বেশ বোঝা যায়।

এর গায়ে যে ছোট ছোট কাঁটা থাকে সেগুলি আসলে পরিবর্তিত পত্র (কুর্চ)।

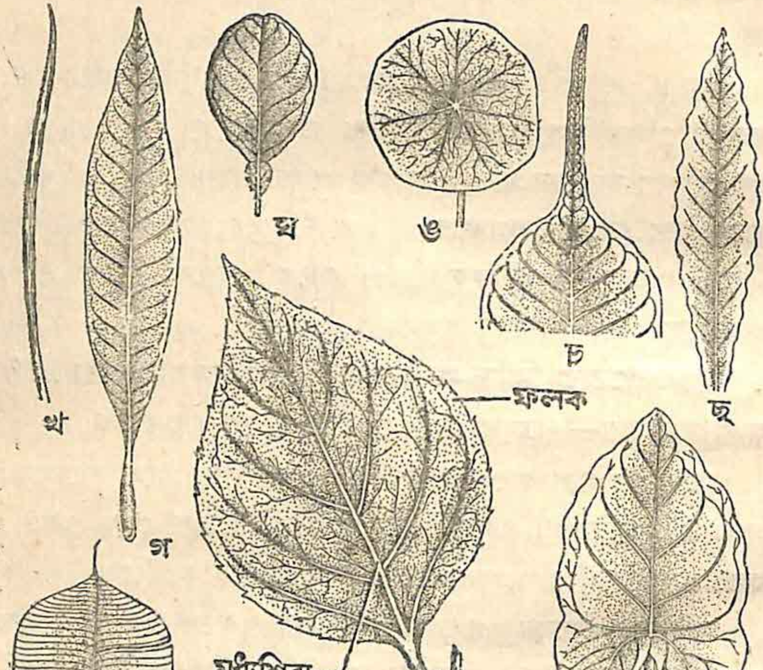
পত্র **ঃ** কাণ্ডের পর্ব থেকে উৎপন্ন চ্যাপ্টা, প্রসারিত অঙ্গকে পত্র বলে। ক্লোরোফিল থাকায়, বেশির ভাগ পত্রের রঙ সবুজ। সূর্যালোকের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করা পত্রের প্রধান কাজ। সবুজ পত্রের আর এক নাম **পল্লবপত্র**। এক উদ্ভিদের পত্রের সঙ্গে অন্য উদ্ভিদের পত্রের কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকে। তবে, বেশির ভাগ পল্লবপত্রের গঠন মোটামুটি এক।

পল্লবপত্রের বিভিন্ন অংশ ঃ পল্লবপত্রে সাধারণতঃ চারটি অংশ দেখা যায়— পত্রমূল, উপপত্র, বোঁটা বা বৃন্ত এবং ফলক।

পত্রের যে অংশ কাণ্ডের পর্বের সঙ্গে যুক্ত, তাকে বলে **পত্রমূল**। আম (26 নং চিত্র-গ), অপরাজিতা প্রভৃতির পত্রমূল বেশ মোটা। কলা, ধান ইত্যাদির পত্রমূল কাণ্ডের পর্বমধ্যকে ঢেকে রাখে।

অধিকাংশ পত্রের গোড়ায়, পত্রমূলের দুপাশে দুটি সরু, সবুজ রঙের **উপপত্র** থাকে। গোলাপের (26 নং চিত্র-ট) উপপত্র দুটি জোড়া থাকলেও, বেশ বোঝা যায়। গন্ধরাজের উপপত্র দুটি জোড়া থাকে এবং একটি বলে মনে হয়। মটর গাছের উপপত্র দুটি জোড়া থাকে (26 নং চিত্র-ঠ) এবং সাধারণ পত্রের মতো দেখায়। উপপত্র অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। যেমন— কুলপাতার গোড়ার কাঁটা দুটি আসলে উপপত্র (26নং চিত্র-ঞ) ; কুমারিকার আকর্ষ দুটিও তাই। শিয়ালকাঁটা, মুলা, আকন্দ প্রভৃতি কতকগুলি পত্র ছাড়া, বেশির ভাগ পত্রের ফলক ও পত্রমূলের মাঝখানে ডাঁটির মতো **বৃন্ত** থাকে। বৃন্ত থাকলে পত্রকে **সবৃন্তক**, না থাকলে **অবৃন্তক** বলা হয়। কচুরি-পানার পত্রের বৃন্ত মোটা এবং স্পঞ্জের মতো নরম। লেবুপাতার বৃন্ত ফলকের মতো, কিন্তু ছোট (26 নং চিত্র-ঘ)।

বৃন্তের ডগায় থাকে **ফলক**। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলক সাধারণতঃ মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকায়, উপরের তলে বেশি আলো পায়। সেইজন্য, এই ফলকের দুই তল একরকম নয়। বেশির ভাগ



26 নং চিত্র – কয়েক রকম পত্র : ক. পত্রের বিভিন্ন অংশ (জবা) ; খ. পাইন ; গ. আম ; ঘ. লেবু ; ঙ. পদ্ম ; চ. অশ্বত্থের পত্রের ডগার দিক ; ছ. দেবদারু ; জ. কলাপাতার ডগার দিক ; ঝ. মানকচু ; ঞ. কুল ; ট. গোলাপ ; ঠ. মটর ; ড. শিমুল।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলক মাটির সঙ্গে খাড়াভাবে থাকায়, দুদিকেই সমান আলো পায় কাজেই, এইরকম ফলকের দুই তলের খুব একটা পার্থক্য থাকে না। নানা ফলকের আকার ও গঠন নানারকম। পাইনের পত্র সুচের মতো (26 নং চিত্র-খ) ; ঘাসের ফলক সরু ও লম্বা ; পদ্ম, শালুক ইত্যাদির ফলক গোল (26 নং চিত্র-ঙ) ; জবা, বট, পাথরকুচি প্রভৃতির ফলক ডিম্বাকার ; মানকচুর ফলক তীরের ফলার মতো (26 নং চিত্র-ঝ) ; আম (26 নং চিত্র-গ), দেবদারু, করবী প্রভৃতির ফলক বর্শার ফলার মতো।

ফলকের কিনারাও নানা রকমের ঃ আম (26 নং চিত্র-গ), বট প্রভৃতির ফলকের কিনারায় খাঁজ থাকে না, জবা (26 নং চিত্র-ক), দোপাটি ইত্যাদির ফলকের কিনারায় করাতের মতো দাঁত থাকে ; থানকুনি, পাথরকুচি ইত্যাদির ফলকের কিনারায় গোল দাঁত দেখা যায় ; দেবদারু পাতার কিনারা ঢেউ খেলানো (26 নং চিত্র-ছ) ; আনারসের ফলকের কিনারায় কাঁটা থাকে।

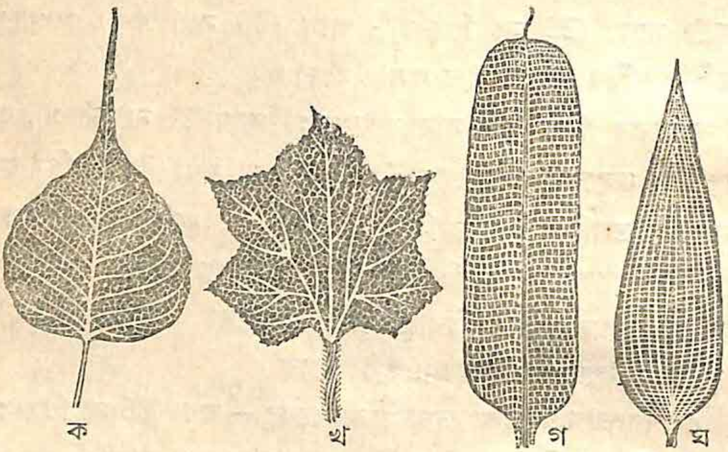
বেশির ভাগ ফলকের ডগা সরু। যেমন— জবা (26 নং চিত্র-ক), আম (26 নং চিত্র-গ) ইত্যাদি ; বটপাতার ডগা গোল ; অশ্বত্থের ফলকের ডগা সরু ও বেশ কিছুটা লম্বা (26 নং চিত্র-চ) ; কলাপাতার ডগা সূতার মতো (26 নং চিত্র-জ)।

সাধারণতঃ দ্বিবীজপত্রী পত্রের ফলকের বৃন্ত থেকে ডগা পর্যন্ত একটি মোটা শিরা থাকে। একে বলে **প্রধান শিরা** বা **মধ্যশিরা**। প্রধান শিরা থেকে শাখা-শিরা এবং শাখা-শিরা থেকে প্রশাখা-শিরা বেরিয়ে ফলকের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। এইরকম শিরাবিন্যাসকে **জালিকা শিরাবিন্যাস** বলে। অশ্বত্থ পাতার শিরা-বিন্যাস (27 নং চিত্র-ক) এইরকম। আবার, কুমড়া (27 নং চিত্র-খ), লাউ প্রভৃতির ফলকে তিনটি করে প্রধান শিরা দেখা যায়।

একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফলকে একটি অথবা চার-পাঁচটি প্রধান শিরা থাকে এবং প্রধান শিরা থেকে সমান্তরালভাবে শিরা-উপশিরা বের হয়। এইরকম শিরাবিন্যাসকে **সমান্তরাল শিরাবিন্যাস** বলে।

যেমন— বাঁশপাতা (27 নং চিত্র-ঘ), কলাপাতা (27 নং চিত্র-গ), তেজপাতার শিরাবিন্যাস।

মটর, তেঁতুল, গোলাপ (26 নং চিত্র-ট), শিমুল (26 নং চিত্র-ড) প্রভৃতির ফলক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলি আলাদা আলাদা, কোনওটির সঙ্গে কোনওটির সংযোগ নেই, দেখতে ছোট পাতার মতো। এইগুলিকে বলে **অণুফলক**। একটি ডাঁটার দুপাশে



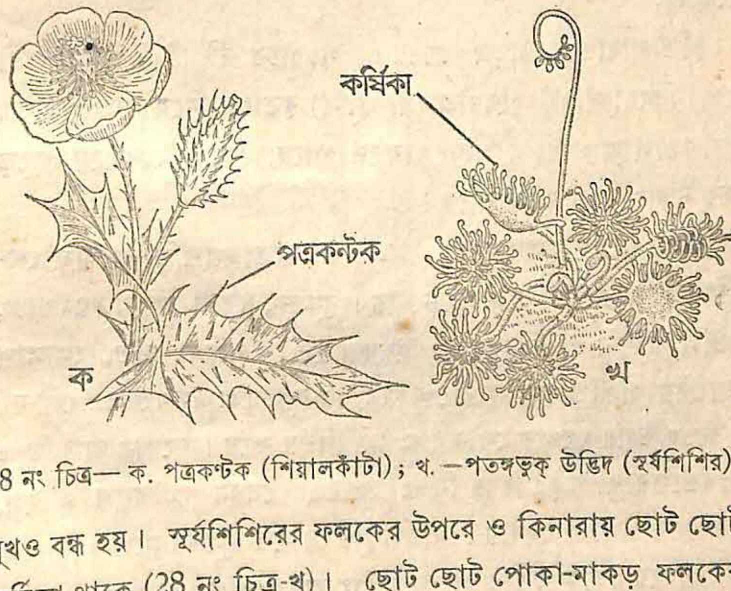
27 নং চিত্র— শিরাবিন্যাস : ক. ও খ. জালিকা শিরাবিন্যাস (ক. অশ্বত্থ পাতা, খ. কুমড়া পাতা) ; গ. ও ঘ. সমান্তরাল শিরাবিন্যাস (গ. কলাপাতা, ঘ. বাঁশপাতা)।

অণুফলকগুলি জুড়ে থাকে। ডাঁটি ও অণুফলক মিলে একটি সম্পূর্ণ পত্র হয়। এই ধরনের পত্রকে **যৌগিক পত্র** বা **যৌগপত্র** বলে। আম, পদ্ম, জবা, বট প্রভৃতি পত্রের ফলক গোটা, অর্থাৎ খণ্ডে বিভক্ত নয়। এইরকম পত্রকে **একক পত্র** বলে (26 নং চিত্র-ক থেকে ঞ)।

পত্রের পরিবর্তন ঃ পত্রেরও নানা অংশ অথবা সমগ্র পত্র, বিশেষ কাজের জন্য, নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। পাথরকুচি, ঘৃত-কুমারী প্রভৃতির পত্র খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য, বেশ পুরু ও রসালো। মটর গাছের যৌগপত্রের শেষ কয়েকটি অণুফলক এবং কুমারিকা গাছের উপপত্র আকর্ষে পরিবর্তিত হয়। ফণিমনসার

কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট কাঁটাগুলি আসলে পরিবর্তিত পত্র। এদের কূর্চ (25 নং চিত্র-চ) বলে। শিয়ালকাঁটার পত্রের কিনারা কাঁটায় পরিবর্তিত হয় (28 নং চিত্র-ক)। এইরকম কাঁটাকে পত্রকণ্টক বলা হয়।

কয়েক ধরনের উদ্ভিদ পোকা-মাকড় ধরে খায়। এদের বলে **পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ**। পোকা-মাকড় ধরার জন্য এদের পত্র নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে, ফাঁদ তৈরি করে ; যেমন— ঘটপত্রী উদ্ভিদের ফলক ঢাক্‌না-দেওয়া ছোট কলসীর মতো। ছোট ছোট পোকা-মাকড় কলসীর মুখের কাছে বসলে, পিছলে ভিতরে চলে যায় এবং ঢাক্‌নার



28 নং চিত্র— ক. পত্রকণ্টক (শিয়ালকাঁটা) ; খ. —পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (সূর্যশিশির)।

মুখও বন্ধ হয়। সূর্যশিশিরের ফলকের উপরে ও কিনারায় ছোট ছোট কর্ষিকা থাকে (28 নং চিত্র-খ)। ছোট ছোট পোকা-মাকড় ফলকের উপর বসলে, কর্ষিকাগুলি তাদের ফলকের মাঝখানে চেপে ধরে।

পুষ্প **:** পুষ্প উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুষ্প উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। নিচে বিভিন্ন ধরনের পুষ্প এবং পুষ্পের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হল।

পুষ্পের প্রকারভেদ : কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার ডগায় কিংবা কক্ষে একটিমাত্র পুষ্প থাকলে, তাকে একক পুষ্প বলা হয় ;

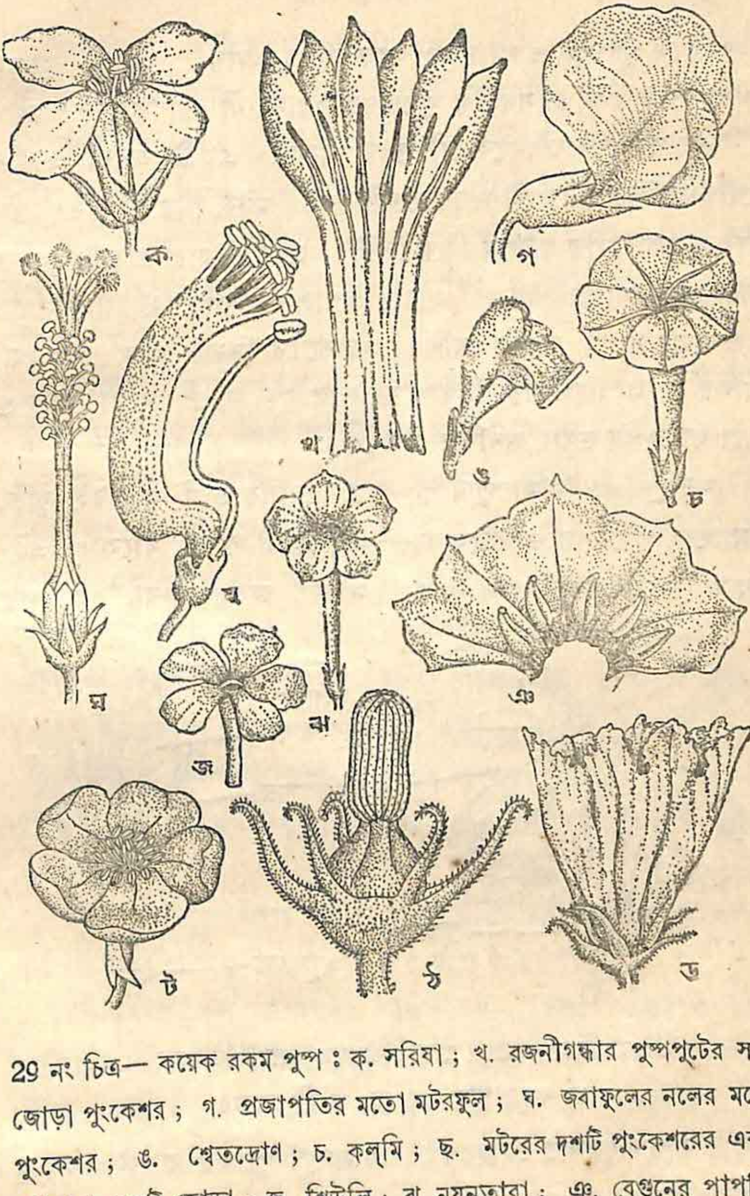
যেমন— কুমড়া। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ ধরনের একটি ডাঁটির উপর অনেকগুলি পুষ্প জন্মায়। এই ডাঁটিকে **মঞ্জরীদণ্ড**, এবং পুষ্পসহ মঞ্জরীদণ্ডকে **পুষ্পবিন্যাস** বলে। আম, রজনীগন্ধা, সরিষা, ধান প্রভৃতি গাছে পুষ্পবিন্যাস দেখা যায়। সূর্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতির 'ফুল' আসলে এক-একটি বিশেষ ধরনের পুষ্পবিন্যাস।

পুষ্পের বিভিন্ন অংশ ঃ ষষ্ঠ শ্রেণীতে মটর, পদ্ম প্রভৃতি কয়েকটি পুষ্পের গঠন আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ পুষ্পে **বৃতি**, **দলমণ্ডল**, **পুং-স্তবক** এবং **স্ত্রী-স্তবক**— এই চারটি স্তবক **পুষ্পাক্ষ** নামে একটি চ্যাপ্টা ও প্রসারিত অংশের উপর সাজানো থাকে।

বৃতি সাধারণতঃ সবুজ রঙের। সচরাচর তিনটি (একবীজপত্রী পুষ্পে) কিংবা পাঁচটি (দ্বিবীজপত্রী পুষ্পে) **বৃত্যংশ** নিয়ে বৃতি গঠিত। বৃত্যংশগুলি আলাদা আলাদা থাকতে পারে, কিংবা একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে নলের মতো হতে পারে।

বৃতির পরেই **দলমণ্ডল**। বৃত্যংশের মতো পাপড়ি বা দলাংশ-গুলি সময় সময় একসঙ্গে জুড়ে যায়। কুমড়া, ধুতুরা, রঙ্গন, নয়নতারা, শিউলি, তুলসী প্রভৃতি পুষ্পে এইরকম হয়। সরিষা, মটর, গোলাপ ইত্যাদির পাপড়ি জোড়া থাকে না। সাধারণতঃ দলমণ্ডলের সৌন্দর্য ও রঙের উপর পুষ্পের সৌন্দর্য ও রঙ নির্ভর করে। পুষ্পের আকৃতি-ও দলমণ্ডলের পাপড়ির উপর নির্ভর করে; যেমন—মটরফুল ফুটলে, প্রজাপতির মতো দেখায়; সরিষাফুল দেখতে ক্রুশের মতো।

বাইরে থেকে তৃতীয় স্তবককে **পুং-স্তবক** বলে। কয়েকটি **পুং-কেশর** নিয়ে পুং-স্তবক গঠিত। পুংকেশরের সংখ্যা বিভিন্ন পুষ্পে বিভিন্ন রকম। যেমন— পদ্মফুলে অগণিত, মটরফুলে দশটি, সরিষায় ছটি; আবার, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতির পুষ্পে মাত্র একটি পুংকেশর থাকে। পুংকেশরের দুটি অংশ— সরু দণ্ডের মতো **পুংদণ্ড** এবং পুংদণ্ডের ডগায় অবস্থিত **পরাগধানী**। জবাফুলের পুংদণ্ডগুলি একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে, নলের মতো হয়। রজনীগন্ধা ও বেগুনফুলের পুংদণ্ডগুলি

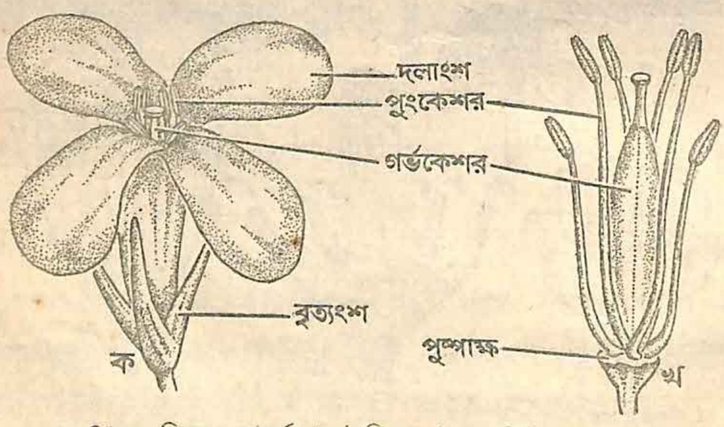


29 নং চিত্র— কয়েক রকম পুষ্প : ক. সরিষা ; খ. রজনীগন্ধার পুষ্পপুটের সঙ্গে জোড়া পুংকেশর ; গ. প্রজাপতির মতো মটরফুল ; ঘ. জবাফুলের নলের মতো পুংকেশর ; ঙ. শ্বেতদ্রোণ ; চ. কল্‌মি ; ছ. মটরের দশটি পুংকেশরের একটি আলাদা ও নটি জোড়া ; জ. শিউলি ; ঝ. নয়নতারা ; ঞ. বেগুনের পাপড়ির সঙ্গে জোড়া পুংকেশর ; ট. গোলাপ ; ঠ. কুমড়ার সবগুলি পুংকেশর জোড়া ; ড. কুমড়াফুল (পুং)।

যথাক্রমে পুষ্পপুট ও পাপড়ির সঙ্গে জুড়ে থাকে। আবার কুমড়া, শসা, লাউ প্রভৃতির সবগুলি পুংকেশর পরাগধানী বরাবর জুড়ে থাকে।

পুষ্পের শেষ স্তবককে **স্ত্রী-স্তবক** বলে। একটি অথবা একটির বেশি **গর্ভপত্র** নিয়ে স্ত্রী-স্তবক তৈরী হয়। মটর, শিম প্রভৃতির স্ত্রী-স্তবক একটি মাত্র গর্ভপত্র দিয়ে তৈরী। জবা, পেয়ারা প্রভৃতি পুষ্পের গর্ভপত্রের সংখ্যা পাঁচ। আবার গোলাপ, পদ্ম, কাঁঠালি-চাঁপার গর্ভপত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। গর্ভপত্রের তিনটি অংশ—পুষ্পাক্ষ-সংলগ্ন ফোলা **ডিম্বাশয়**, ডিম্বাশয়ের সঙ্গে যুক্ত দণ্ডের মতো **গর্ভদণ্ড** এবং গর্ভদণ্ডের ডগায় অবস্থিত **গর্ভমুণ্ড**।

সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুষ্প : বেশির ভাগ পুষ্পেরই বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর— এই চারটি স্তবক থাকে। এই-রকম পুষ্পকে **সম্পূর্ণ পুষ্প** বলে। সরিষা, জবা, ধুতুরা, বক, পদ্ম



30 নং চিত্র— আদর্শ পুষ্প(সরিষাফুল)-এর বিভিন্ন অংশ :
ক সমগ্র পুষ্প ; খ. পুং- ও স্ত্রী-স্তবক।

প্রভৃতি সম্পূর্ণ পুষ্পের উদাহরণ। যে সম্পূর্ণ পুষ্পের চারটি স্তবকই অপরিবর্তিত থাকে, তাকে **আদর্শ পুষ্প** বলা হয়। সরিষাফুলকে আদর্শ পুষ্প বলা যায়। কোনও কোনও পুষ্পে চারটি স্তবকের সবকটি স্তবক না-ও থাকতে পারে। এই ধরনের পুষ্পকে **অসম্পূর্ণ পুষ্প** বলা হয়। যেমন— কুমড়াফুল।

রজনীগন্ধা, অর্কিড (Orchid) প্রভৃতি পুষ্পের বৃতি ও দলমণ্ডল আলাদা করা যায় না, সবগুলিকেই পাপড়ি বলে মনে হয়। সেইজন্য, এইরকম পুষ্পের এই স্তবক দুটিকে একসঙ্গে **পুষ্পপুট** বলে। প্রায় সমস্ত একবীজপত্রী এবং কয়েকটি দ্বিবীজপত্রী পুষ্পে পুষ্পপুট থাকে। পুষ্পপুট সবুজ এবং বৃতির মতোও হতে পারে (যেমন— আমলকী)। যে সমস্ত পুষ্পে পুষ্পপুট থাকে, সেগুলি অসম্পূর্ণ পুষ্প।

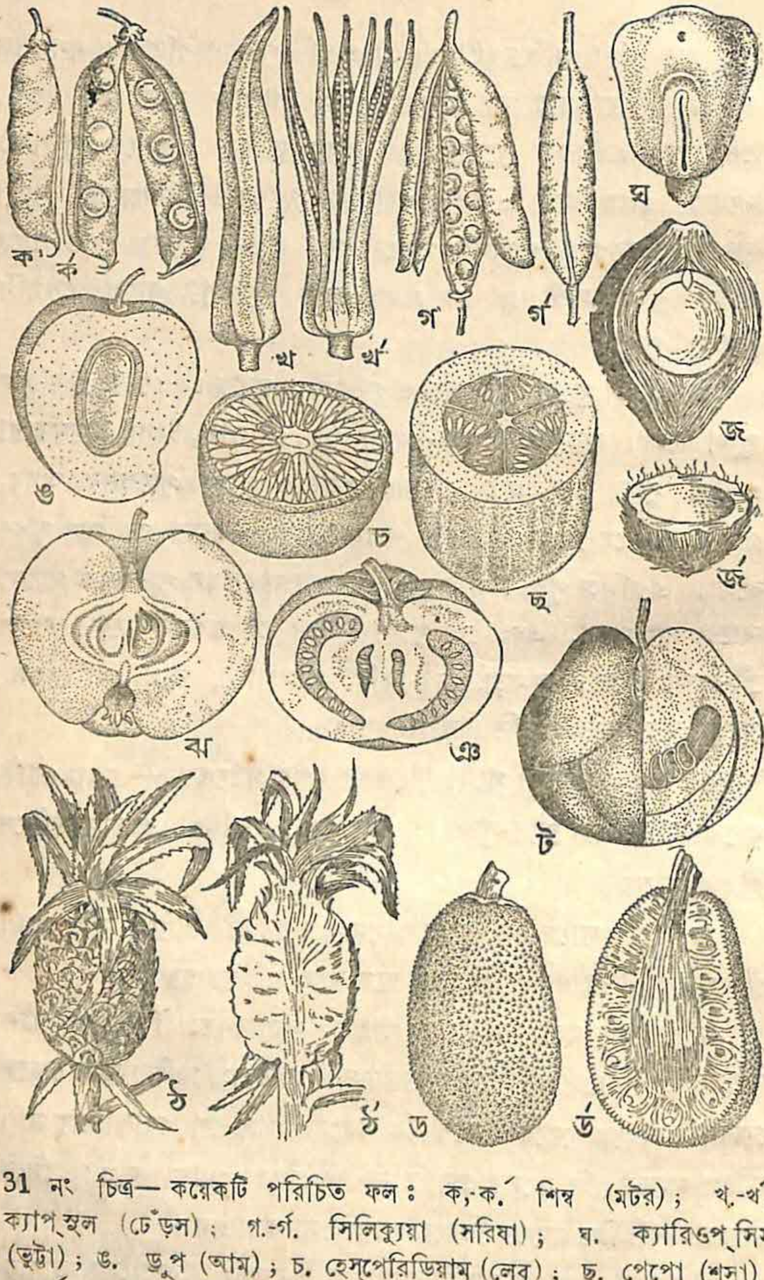
অধিকাংশ পুষ্পে পুংকেশর ও গর্ভকেশর থাকে। এদের **উভলিঙ্গ পুষ্প** বলে। জবা, মটর, রজনীগন্ধা, পদ্ম, গোলাপ, চাঁপা, নয়নতারা প্রভৃতি পুষ্প উভলিঙ্গ। কোনও কোনও পুষ্পে পুংকেশর অথবা গর্ভকেশর—যে-কোনও একটি স্তবক থাকে। এদের **একলিঙ্গ পুষ্প** বলে। একলিঙ্গ পুষ্পও অসম্পূর্ণ। যে পুষ্পে কেবল পুং-স্তবক থাকে, তাকে **পুং-পুষ্প**, এবং যে পুষ্পে কেবল স্ত্রী-স্তবক থাকে, তাকে **স্ত্রী-পুষ্প** বলে। কুমড়া, মুক্তাঝুরি, লালপাতা, তাল, নারিকেল, খেজুর, কচু, ডুমুর প্রভৃতি একলিঙ্গ পুষ্প।

কতকগুলি অসম্পূর্ণ পুষ্পে পুংকেশর অথবা গর্ভকেশর— কোনওটাই থাকে না। এরা **ক্লীব-পুষ্প**। ওল, কচু, সূর্যমুখী প্রভৃতি উদ্ভিদে ক্লীব পুষ্প হয়।

ফল ঃ আগে বলা হয়েছে, সমস্ত গুপ্তবীজী উদ্ভিদে ফল হয়। স্ত্রী-স্তবকের ডিম্বাশয় পরিবর্তিত হয়ে ফলে পরিণত হয়।

নানারকম ফল আমাদের খাদ্য। সাধারণতঃ ভিতরের গঠন অনুযায়ী, ফলের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সুতরাং, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কেবল বাইরে থেকে দেখে কি ধরনের ফল, তা বোঝা যায় না। সামান্য কতকগুলি ফলের প্রকৃতি বাইরে থেকে বোঝা যায়। নিচে কয়েকটি পরিচিত ফলের বিষয়ে আলোচনা করা হল।

মটরগাছের ফলকে চলতি কথায় শুঁটি বলে। বিজ্ঞানের ভাষায় এদের নাম শিম্ব। এই ফলগুলি সরু ও লম্বা ; দেখতে যেন শিরা-বরাবর ভাঁজ-করা একটি পাতা। পাতার মতো দেখতে পুরু খোসাকে



31 নং চিত্র— কয়েকটি পরিচিত ফল : ক,-ক´ শিম্ব (মটর) ; খ.-খ´. ক্যাপ্‌সুল (ঢেঁড়স) ; গ.-গ´. সিলিকুয়া (সরিষা) ; ঘ. ক্যারিওপ্‌সিস (ভুট্টা) ; ঙ. ড্রুপ (আম) ; চ. হেসপেরিডিয়াম (লেবু) ; ছ. পেপো (শসা) ; জ.-জ´. তন্তুময় ড্রুপ (ডাব ও নারিকেল) ; ঝ. পোম (আপেল) ; ঞ. বেরি (টম্যাটো) ; ট. চালতা ; ঠ.-ঠ´. আনারস ; ড.-ড´. কাঁঠাল ; [ক. থেকে ঘ. নীরস ফল ; ঙ. থেকে ঞ. সরস ফল ; ট. থেকে ড. অপ্রকৃত ফল]।

ফলত্বক্ বলে। খোসা ছাড়ালে, ভিতরের শিরার দুপাশে তিনটি বা চারটি করে বীজ দেখা যায়। অপরাজিতা, বক, শিম, ছোলা, মুগ, মসুর প্রভৃতির ফলও এই ধরনের। পরিণত হলে, শিম্ব-জাতীয় ফল শিরা-বরাবর আপনি-আপনি ফেটে যায় এবং বীজ বেরিয়ে আসে। সেইজন্য, এদের **বিদারী ফল** বলে। শিম্বের বীজ-ই খাদ্য। তবে শিম, বীন, বরবটি প্রভৃতির বীজ ও ফলত্বক্ আমাদের খাদ্য।

সরিষা, মুলা প্রভৃতির ফল-ও বিদারী। এরা দেখতে কিছুটা শিম্বের মতো। তবে, এদের ফলত্বকের ভিতর লম্বালম্বি একটি প্রাকার থাকে। বীজগুলি এই প্রাকারের গায়ে দুপাশে লেগে থাকে ; শিম্বের মতো ফলত্বকের শিরা-বরাবর লেগে থাকে না। এইরকম ফলকে **সিলিকুয়্যা (Siliqua)** বলে।

কতকগুলি বিদারী ফল পরিণত হলে, লম্বালম্বি কয়েকটি ভাগে ফেটে যায়। যতগুলি গর্ভপত্র নিয়ে ডিম্বাশয়টি তৈরী, ফলত্বকে ফাটলের সংখ্যাও সাধারণতঃ ততগুলি। এই ধরনের ফলের নাম **ক্যাপ্সুল (Capsule)**। ঢেঁড়স, কার্পাস, ধুতুরা প্রভৃতি ফল এইরকম।

ধানের খস্‌খসে, শুক্‌না খোসাকে, অর্থাৎ তুষকে ফলত্বক্ বলে মনে হয়। তুষ আসলে পুষ্পের অংশ। তুষ ছাড়ালে ফল (চাউল) বেরিয়ে আসে। ফলের মধ্যে একটিমাত্র বীজ থাকে ; কিন্তু বীজ ও পাতলা ফলত্বক্ একসঙ্গে জুড়ে থাকায়, দুটিকে আলাদা করা যায় না। যব, গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্যের যে অংশ আমাদের খাদ্য, সেটি আসলে বীজ ও ফলত্বক্। এই ধরনের ফলের নাম **ক্যারিওপ্সিস (Caryopsis)**। ফল পাকলে, এদের ত্বক্ ফেটে বীজ বেরিয়ে আসে না। সেইজন্য, এরা **অবিদারী ফল**।

উপরে যেসব ফল সম্বন্ধে আলোচনা করা হল, তাদের ফলত্বক্ খুব পাতলা, কিংবা চামড়ার মতো পুরু। এদের বলা হয় **নীরস ফল**। নিচে আরও কয়েক রকম ফল সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। এদের ফলত্বক্ রসালো। এদের **সরস ফল** বলা হয়। সরস ফল-ও অবিদারী।

আম, কুল প্রভৃতি ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে। এরা এক ধরনের সরস ফল। আমের খোসা আসলে ফলত্বকের সবচেয়ে বাইরের অংশ। খোসার ভিতরের রসালো খাদ্যাংশ ফলত্বকের মাঝের অংশ। আঁটির বাইরের অংশ বেশ শক্ত ও কাষ্ঠল। এই অংশ ফলত্বকের সবচেয়ে ভিতরের অংশ। আঁটির ভিতরে বীজ থাকে। এই ধরনের ফলকে ড্রুপ (**Drupe**) বলে। নারিকেল, সুপারি, তাল, প্রভৃতিও এক ধরনের ড্রুপ। এদের ফলত্বকের মাঝখানের অংশ তন্তুময়। সেইজন্য, এদের **তন্তুময় ড্রুপ** বলা হয়। তাল ছাড়া, প্রায় সমস্ত ড্রুপেরই একটি করে বীজ থাকে।

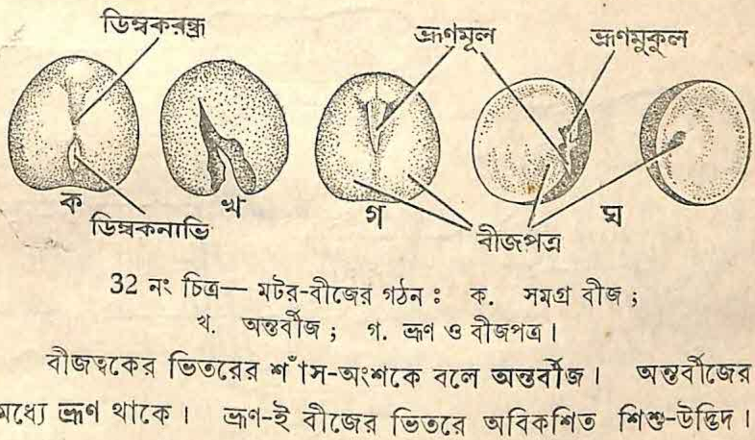
আপেল, নাশপাতি প্রভৃতির ডিম্বাশয় এবং পুষ্পাক্ষ মিলিয়ে ফল গঠিত হয়। এইসব ফলের যে অংশ আমাদের খাদ্য, সেটি রসালো পুষ্পাক্ষ এবং ফলত্বকের বাইরের অংশ। ফলত্বকের মাঝখানের অংশ অনেকটা কাগজের মতো। এইরকম ফলকে পোম (**Pome**) বলে।

বেগুন, টম্যাটো প্রভৃতি ফলকে বেরি (**Berry**) বলে। পরিণত বেরির বীজগুলি ফলত্বকের সঙ্গে লেগে থাকে না, অর্থাৎ, আলাদা থাকে। এদের ফলত্বকের প্রায় সব অংশই নরম ও রসালো। লাউ, কুমড়া, শসা, প্রভৃতির ফল কতকটা বেরির মতো। তবে, এইরকম ফল পরিণত হলেও, বীজগুলি ফলত্বকের গায়ে লেগে থাকে। এইধরনের ফলকে বলা হয় পেপো (**Pepo**)। কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবি-লেবু প্রভৃতি ফলকে হেস্‌পেরিডিয়াম (**Hesperidium**) বলা হয়। এদের ফলত্বকের বাইরের ও মাঝের অংশ মিলে চামড়ার মতো আবরণ গঠন করে। ফলত্বকের ভিতরের গায়ে অসংখ্য, রসালো রোম লেগে থাকে। এই রোমগুলিই খাদ্য।

এ পর্যন্ত যতগুলি ফলের কথা আলোচনা করা হল, তারা সকলেই ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই, এরা সকলেই **প্রকৃত ফল**। বেশির ভাগ ফলই প্রকৃত ফল। অনেক সময় ডিম্বাশয় ছাড়া পুষ্পের অন্যান্য অংশ (যেমন— রসালো পুষ্পাক্ষ, বৃতি, পুষ্পপুট ইত্যাদি)

পরিবর্তিত হয়ে, সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে একটি ফল তৈরি করে। এইরকম ফলকে অপ্রকৃত ফল বলে। আতা, চালতা, ডুমুর, আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি এইধরনের ফল।

বীজ ঃ বীজের খোসাকে বলে **বীজত্বক্**। মটর-বীজের বীজত্বকের রঙ হাল্‌কা হলুদ কিংবা সবুজ, গঠন পুরু ও চামড়ার মতো, কিন্তু মসৃণ। বীজত্বকের এক পাশে একটি অবনত অংশ থাকে। ঐ অংশকে **ডিম্বকনাভি** বা **হাইলাম (Hilum)** বলে। হাইলামের কাছেই একটি ছোট ছিদ্র থাকে। একে **ডিম্বকরন্ধ্র** বা **মাইক্রোপাইল (Micropyle)** বলে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক মূল বের হয়। মটর বীজের বীজত্বকের দুটি অংশ। বাইরেরটির নাম **বীজ-বহিস্তক্**। এর ভিতরের দিকে খুব পাতলা আর একটি ত্বক্ বীজ-বহিস্তকের সঙ্গে জুড়ে থাকে। একে **বীজ-অন্তস্ত্বক্** বলে।



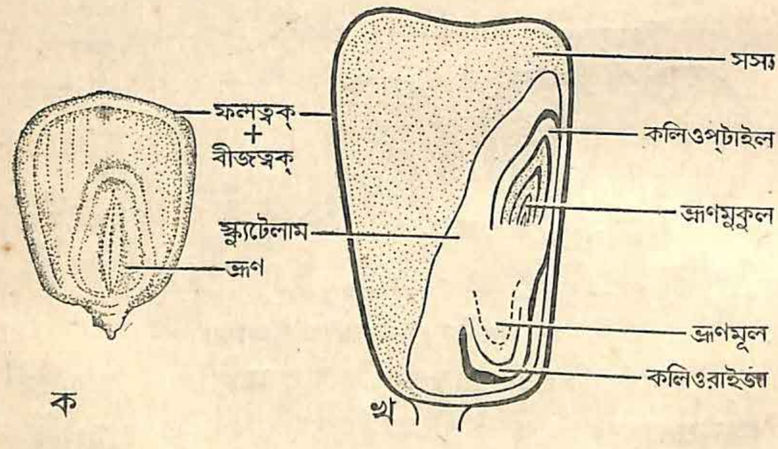
32 নং চিত্র— মটর-বীজের গঠন ঃ ক. সমগ্র বীজ ; খ. অন্তর্বীজ ; গ. ভ্রূণ ও বীজপত্র।

বীজত্বকের ভিতরের শাঁস-অংশকে বলে **অন্তর্বীজ**। অন্তর্বীজের মধ্যে **ভ্রূণ** থাকে। ভ্রূণ-ই বীজের ভিতরে অবিকশিত শিশু-উদ্ভিদ। অন্তর্বীজে একটু চাপ দিলে, দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেকটি ভাগ এক-একটি **বীজপত্র**। মটরের বীজপত্র শিশু-উদ্ভিদের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে ; ফলে, বীজপত্র দুটি পুরু ও রসালো। একটি ছোট অক্ষের দুপাশে বীজপত্র দুটি জোড়া থাকে। অক্ষটিকে **ভ্রূণাক্ষ** বলে। ভ্রূণাক্ষের উপরের দিককে **ভ্রূণমুকুল** এবং নিচের দিককে **ভ্রূণমূল** বলে। ভ্রূণমূল এবং ভ্রূণমুকুল থেকে যথাক্রমে প্রাথমিক মূল ও কাণ্ড বের হয়।

দুটি বীজপত্র থাকার জন্য, মটর-বীজ একটি **দ্বিবীজপত্রী বীজ**। চেহারার পার্থক্য ছাড়া, বেশির ভাগ দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন মোটামুটি মটর-বীজের মতো।

কতকগুলি দ্বিবীজপত্রী বীজে ভ্রূণ ছাড়া আর একটি অংশ থাকে। এক নাম **সস্য**। সস্য খাদ্য-সঞ্চয়কারী বিশেষ ধরনের অঙ্গ। যে সমস্ত বীজে সস্য থাকে, তাদের বলা হয় **সস্যল বীজ**। সস্য না থাকায়, মটর-বীজ **অসস্যল বীজ**। যে সমস্ত বীজে সস্য থাকে, তাদের বীজপত্র খুব ছোট অথবা পাতলা। রেড়ির বীজ এই ধরনের সস্যল বীজ।

একবীজপত্রী বীজ-এ একটি বীজপত্র থাকে। বেশির ভাগ একবীজপত্রী বীজে সস্য থাকে। গম, ধান, ভুট্টা প্রভৃতির বীজ এই ধরনের।



33 নং চিত্র—ভুট্টা-দানার গঠন : ক. সমগ্র দানা ; খ দানার দীর্ঘচ্ছেদ ; গ. ভ্রূণ।

ভুট্টার দানাগুলি এক-একটি বীজ। আগে বলা হয়েছে, ভুট্টার বীজ ও ফলত্বক্ জোড়া থাকায়, দুটিকে আলাদা করা যায় না। দানার এক পাশে একটি তিন-কোণা ছোট উঁচু অংশ দেখা যায়। ঐ অংশে ভ্রূণ থাকে। দানার চার ভাগের তিন ভাগ জুড়ে থাকে সস্য। সস্যের এক প্রান্তে অল্প কিছুটা জায়গায় ভ্রূণ থাকে। ভ্রূণ ও সস্য

আলাদা করা যায়। ভ্রূণে ঢালের মতো একটিমাত্র বীজপত্র থাকে। এর নাম **স্ক্যুটেলাম (Scutellum)**। বীজপত্রের নিচের দিকে ভ্রূণাক্ষ, এবং ভ্রূণাক্ষের দুপাশে ভ্রূণমুকুল ও ভ্রূণমূল থাকে। ভ্রূণমুকুল এবং ভ্রূণমূল এক-একটি পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। আবরণ দুটিকে যথাক্রমে **কলিওপ্‌টাইল (Coleoptile)** এবং **কলিওরাইজা (Coleorhiza)** বলা হয়। কচু প্রভৃতি অল্প কয়েকটি একবীজপত্রী বীজে সস্য থাকে না।

প্রাণীর বাহ্য গঠন : নিচে কয়েকটি পরিচিত মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বাহ্য গঠন বর্ণনা করা হল।

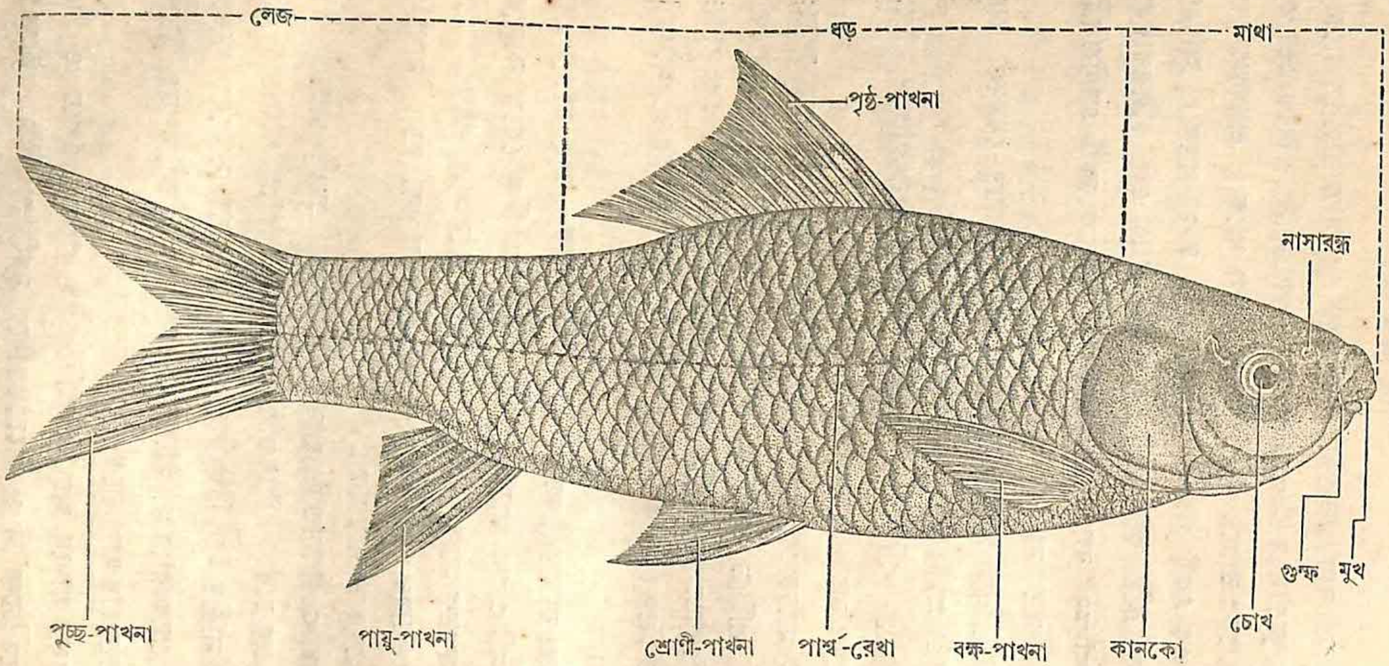
মাছ : পরিচিত মাছের মধ্যে **রুই মাছ** উল্লেখযোগ্য। নিচে রুই মাছের বাহ্য গঠন আলোচনা করা হল।

রুই মাছের দেহ লম্বাটে, দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং দুপাশে চাপা। পরিণত রুই 125 সেন্টিমিটারেরও বেশি লম্বা হয়ে থাকে। দেহ, বিশেষতঃ পাখনাগুলি, লাল্‌চে রঙের। পিঠের দিক এবং মাথার সামনের দিকের রঙ কতকটা কাল্‌চে। পেটের দিকের রঙ অনেকটা হাল্‌কা।

মাথা বা মস্তক, **ধড়** বা দেহকাণ্ড ও **লেজ**— রুই মাছের দেহ এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত। সামনের দিক থেকে কানকো পর্যন্ত অংশকে মাথা, কানকোর পিছনদিক থেকে পায়ু পর্যন্ত অংশকে ধড় এবং পায়ুর পর থেকে বাকী অংশকে লেজ বলা হয়। মাথা ও লেজ, ধড়ের তুলনায় সরু।

মাথা ও পাখনাগুলি ছাড়া, রুই মাছের দেহের অন্যান্য অংশ **আঁশ** দিয়ে ঢাকা। আঁশগুলি দেহে সারিবদ্ধভাবে সাজানো, এবং কোনও সারির আঁশ ঠিক পিছনের সারির আঁশের সামনের অংশকে কিছুটা ঢেকে রাখে। আঁশের কিনারা মসৃণ। রুই মাছের আঁশের গায়ে বৃত্তাকার দাগ থাকে।

মাথার সামনে, অল্প নিচের দিকে **মুখ** থাকে। উপরে ও নিচে যথাক্রমে **ঊর্ধ্বোষ্ঠ** ও **নিম্নোষ্ঠ** দিয়ে মুখটি সুরক্ষিত। ঊর্ধ্বোষ্ঠ



34 নং চিত্র—রুই মাছের বাহ্য গঠন।

ও নিম্নোষ্ঠের সংযোগ-স্থলে, মুখের দুপাশে দুটি ছোট গুম্ফ থাকে। মুখের পিছনে, উপরের দিকে দুটি **নাসারন্ধ্র** দেখা যায়। প্রত্যেকটি নাসারন্ধ্রের পিছনে একটি করে গোল **চোখ** থাকে। কেবল **উপপল্লব** নামের একটি ঈষদচ্ছ পর্দার সাহায্যে চোখ বন্ধ হতে পারে। মাথার শেষভাগের দুপাশে দুটি অর্ধচন্দ্রাকার **কানকো** দেখা যায়।

মাথার পিছনদিক থেকে লেজ পর্যন্ত দেহাংশের দুপাশে দুটি লম্বা দাগ দেখা যায়। এদের **পার্শ্ব রেখা** বলা হয়।

দেহকাণ্ড ও লেজের সংযোগ-স্থলে, পেটের দিকে একটি সামান্য ফোলা যায়গা দেখা যায়। ঐখানে **পায়ু** এবং পায়ুর কাছে **মূত্র-ছিদ্র** ও **জনন-ছিদ্র** থাকে।

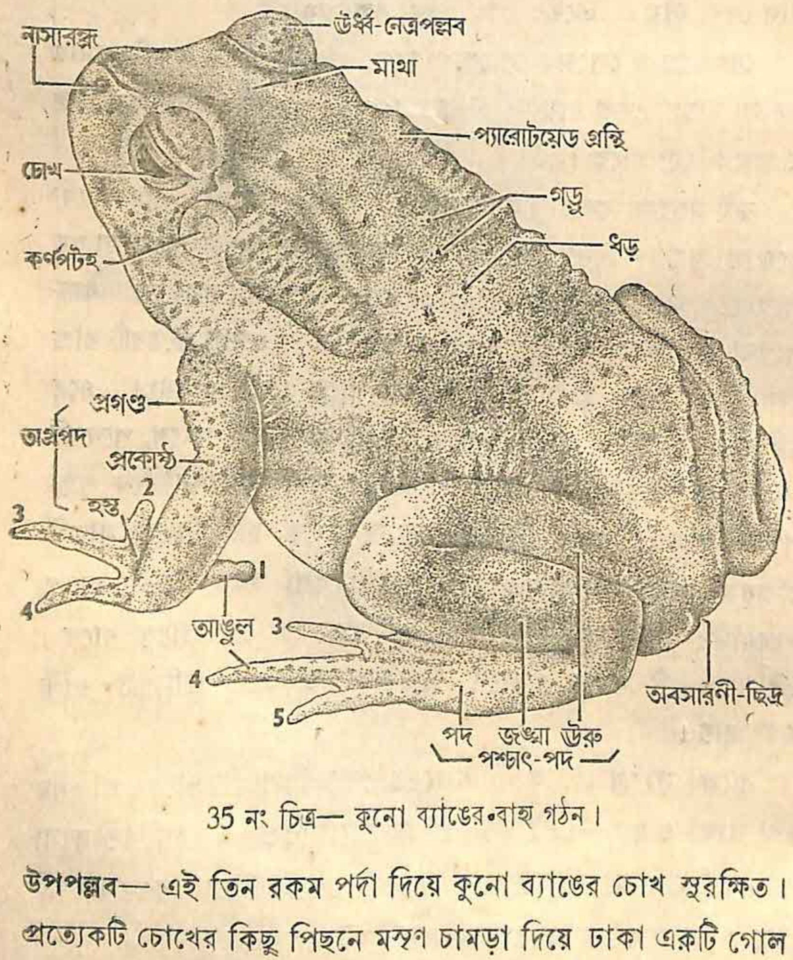
রুই মাছের দেহে মোট সাতটি পাখনা আছে। এদের মধ্যে দুজোড়া **যুগ্ম পাখনা** এবং তিনটি **অযুগ্ম পাখনা**। দুজোড়া যুগ্ম পাখনাকে যথাক্রমে **বক্ষ-পাখনা** এবং **শ্রোণী-পাখনা** বলা হয়। বক্ষ-পাখনা কানকোর পিছনদিকে থাকে এবং এতে মোট সতেরটি রশ্মি দেখা যায়। বক্ষ-পাখনার পিছনদিকে থাকে শ্রোণী-পাখনা। এতে নটি রশ্মি থাকে। ধড়ের পিঠের দিকের মাঝামাঝি অংশে, পনেরটি কিংবা ষোলটি রশ্মিযুক্ত, বড় ও ত্রিকোণাকার অযুগ্ম পাখনাটিকে **পৃষ্ঠ-পাখনা** বলে। পায়ুর পিছনে, পেটের দিকে ছটি কিংবা সাতটি রশ্মিযুক্ত অযুগ্ম পাখনাকে **পায়ু-পাখনা** বলা হয়। তৃতীয় অযুগ্ম পাখনাটির নাম **পুচ্ছ-পাখনা**। এটি লেজের শেষপ্রান্তে থাকে। এই পাখনাটি সমান দুভাগে বিভক্ত এবং এতে উনিশটি রশ্মি দেখা যায়।

কুনো ব্যাঙ ঃ কুনো ব্যাঙের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং **মাথা** ও **ধড়**— এই দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। পরিণত কুনো ব্যাঙের পিঠের রঙ কাল্‌চে ছাই রঙের ; পেটের দিকের রঙ ঘোলাটে সাদা। এরা লম্বায় প্রায় পনের সেন্টিমিটার হয়।

কুনো ব্যাঙের চামড়া খস্‌খসে। দেহের প্রায় সব জায়গায়, বিশেষতঃ পিঠের দিকে, অসংখ্য ছোট-বড় গড়ু থাকে। এদের মাথা

মোটামুটি তিন কোণা, তবে অনেকটা ভোঁতা। মাথার সামনের অংশে খুব বড় **মুখ** থাকে। মুখের উপরে ও নিচে যথাক্রমে **উপরের চোয়াল** এবং **নিচের চোয়াল** থাকে। চোয়ালে দাঁত নেই।

মাথার সামনের দিকে, কিছুটা উপরে এক জোড়া **নাসারন্ধ্র** থাকে এবং প্রত্যেকটি নাসারন্ধ্রের পিছনের দিকে একটি করে বড় গোলাকার **চোখ** দেখা যায়। **ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব, নিম্ন-নেত্রপল্লব** এবং



35 নং চিত্র— কুনো ব্যাঙের বাহ্য গঠন।

উপপল্লব— এই তিন রকম পর্দা দিয়ে কুনো ব্যাঙের চোখ সুরক্ষিত। প্রত্যেকটি চোখের কিছু পিছনে মসৃণ চামড়া দিয়ে ঢাকা একটি গোল অংশ দেখা যায়। একে **কর্ণপটহ** বলে।

ধড়ের পিঠের দিকে, চোখের কিছুটা পিছনে, দুপাশে দুটি লম্বাটে

উঁচু অংশ দেখা যায়। এদের নাম প্যারোটয়েড (Parotoid) গ্রন্থি। ধড়ের শেষপ্রান্তে থাকে **অবসারণী-ছিদ্র**।

ধড়ের সামনের ও পিছনের দিকে যথাক্রমে এক জোড়া **অগ্রপদ** এবং **পশ্চাৎ-পদ** থাকে। অগ্রপদ তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত— **প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ** এবং **হস্ত**। হস্তের সঙ্গে চারটি **আঙুল** যুক্ত থাকে— তৃতীয় আঙুলটি সবচেয়ে লম্বা। পশ্চাৎ-পদও তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত— **উরু, জঙ্ঘা** এবং **পদ**। পশ্চাৎ-পদে পাঁচটি আঙুল থাকে। এদের মধ্যে চতুর্থটি সবচেয়ে বড়। পশ্চাৎ-পদের আঙুলগুলি গোড়ার দিকে পাতলা চামড়া দিয়ে পরস্পর জুড়ে **লিপ্তপাদ** গঠন করে।

টিক্‌টিকি ঃ টিক্‌টিকির দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। **মস্তক** বা মাথা, **গ্রীবা, দেহকাণ্ড** বা ধড় ও **লেজ**— এর দেহের এই প্রধান চারটি অংশ। এরা 20 সেন্টিমিটারেরও বেশি লম্বা হতে পারে। এদের পিঠের দিকের রঙ ধূসর কিংবা বাদামী, পেটের দিকের রঙ অনেক হাল্‌কা। টিক্‌টিকির সারা দেহ ছোট ছোট **আঁশ** দিয়ে ঢাকা।

টিক্‌টিকির তিন-কোণা মাথার সামনের দিকে থাকে মুখ। এর উপরের ও নিচের চোয়ালে অনেকগুলি ছোট ছোট দাঁত আছে। মুখের উপরের দিকে পাশাপাশি দুটি **নাসারন্ধ্র** থাকে। প্রত্যেকটি নাসারন্ধ্রের পিছনে একটি **চক্ষু** বা চোখ থাকে। কুনো ব্যাঙের মতো, টিক্‌টিকির চোখও **ঊর্ধ্ব-নেত্রপল্লব, নিম্ন-নেত্রপল্লব** এবং **উপপল্লব** দিয়ে সুরক্ষিত। প্রত্যেক চোখের পিছনে, অল্প অবনত জায়গায়, মসৃণ চামড়া দিয়ে ঢাকা গোলাকার **কর্ণপটহ** থাকে। অবনত জায়গাটিকে **কর্ণকুহর** বলে।

মাথা ও ধড়ের মাঝখানে ছোট অংশটি টিক্‌টিকির গ্রীবা।

টিক্‌টিকির ধড় উপর-নিচে চাপা। ধড়ের সামনে ও পিছনের দিকে এক জোড়া করে **অগ্রপদ** ও **পশ্চাৎ-পদ** থাকে। প্রত্যেক পায়ে নখর-যুক্ত পাঁচটি আঙুল আছে। আঙুলের মাঝখান মোটা। এই

অঞ্চলের নিচের তলে, দুসারি ছোট ছোট অবতল অংশ সমান্তরাল-ভাবে সাজানো থাকে।

টিক্‌টিকির ধড় ও লেজের সংযোগ-স্থলের নিচের তলে আড়া-আড়িভাবে অবসারণী ছিদ্র থাকে। লেজের গোড়ার দিক মোটা এবং উপর-নিচে চাপা, কিন্তু শেষের দিক সরু এবং বেলনাকার।

পাখি : নানা ধরনের পাখির মধ্যে পায়রা খুবই পরিচিত। নিচে পায়রার বাহ্য গঠন আলোচনা করা হল।

পায়রার দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং মাথা, ঘাড়, ধড় ও লেজ— এই চার ভাগে বিভক্ত। এরা লম্বায় প্রায় 30 সেন্টিমিটার। চোখ, ঠোঁট এবং পায়ের নিচের কিছু অংশ ছাড়া, পায়রার সমস্ত দেহ পালক দিয়ে ঢাকা।

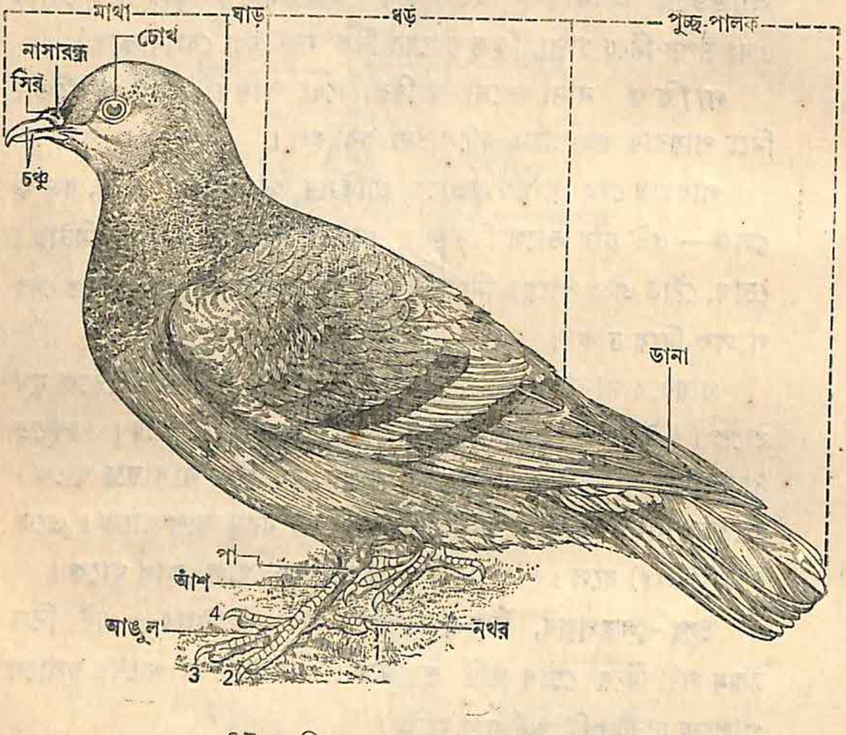
পায়রার মাথা প্রায় গোলাকার। মাথার সামনের দিকে মুখ থাকে। উপর ও নিচের চোয়াল একসঙ্গে চঞ্চু গঠন করে। চঞ্চুতে দাঁত থাকে না। চঞ্চুর গোড়ায় পাশাপাশি দুটি নাসারন্ধ্র থাকে। প্রত্যেক নাসারন্ধ্র ঘিরে পালক-বিহীন একটি নরম অংশ থাকে। একে সির (Cere) বলে। মাথার দুপাশে দুটি বড় গোল চোখ থাকে।

উর্ধ্ব-নেত্রপল্লব, নিম্ন-নেত্রপল্লব এবং উপপল্লব— এই তিন রকম পর্দা দিয়ে চোখ দুটি সুরক্ষিত। মাথার শেষ অংশের দুপাশে পালকে ঢাকা দুটি কর্ণছিদ্র থাকে।

মাথা ও ধড়ের মাঝের অংশকে ঘাড় বলে। পায়রার ঘাড় বেশ লম্বা। পায়রার ধড়ের সামনের দিকের নিচের অংশকে বুক এবং পিছনের দিকের নিচের অংশকে পেট বলা হয়। ধড়ের সামনের অংশে, পিঠের দিকে দুপাশে দুটি ডানা থাকে। অগ্রপদ রূপান্তরিত হয়ে ডানা সৃষ্টি হয়। ডানায় তেইশটি বড় পালক এবং অসংখ্য ছোট পালক থাকে। বড় পালকগুলির নাম রেমিজেস (Remiges)।

ধড়ের শেষভাগের দুপাশ থেকে দুটি পা বের হয়। আগেই বলা হয়েছে, এর পায়ের নিচের দিকে পালক থাকে না ; ছোট ছোট আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। পায়ে নখর-যুক্ত চারটি করে আঙুল দেখা যায়।

চারটি আঙুলের মধ্যে তিনটি সামনের দিকে এবং একটি পিছনদিকে থাকে। ধড়ের শেষপ্রান্তে, পেটের দিকে বড় **অবসারণী-ছিদ্র** এবং অবসারণী-ছিদ্রের পিছনে ছোট একটি লেজ থাকে। বাইরে থেকে

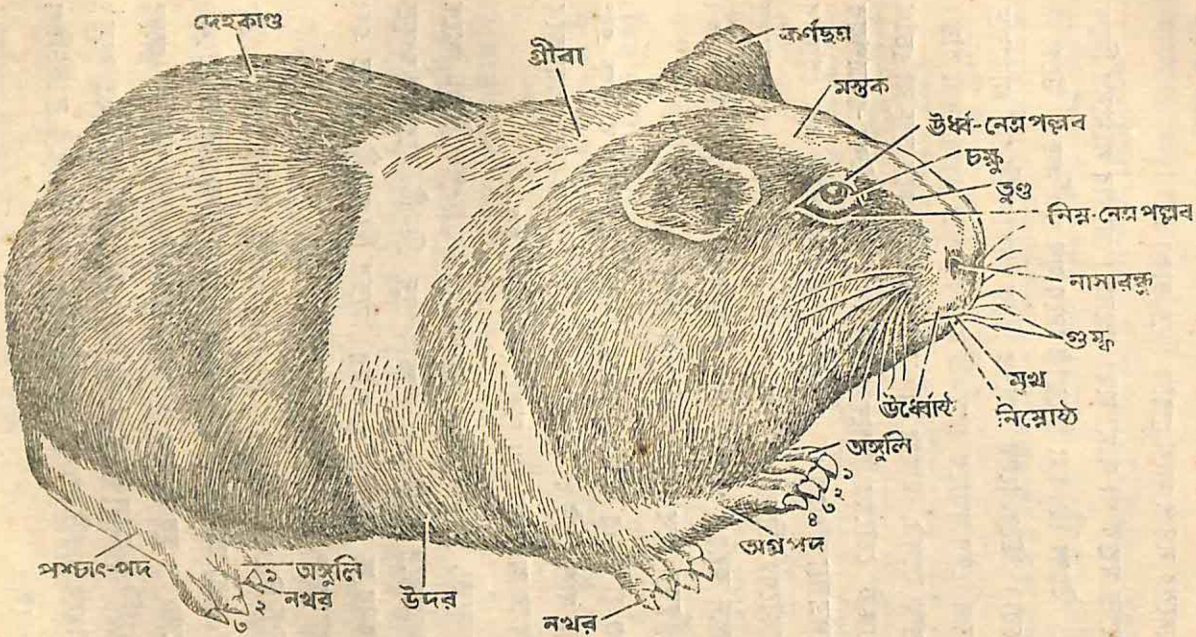


37 নং চিত্র— পায়রার বাহ্য গঠন।

লেজ দেখা যায় না। লেজ থেকে বারোটি বড় পালক বের হয়। এগুলিকে **পুচ্ছ-পালক** বা **রেট্রিসেস (Retrices)** বলে। পায়রার পুচ্ছ-পালকগুলিকে একসঙ্গে পুচ্ছ-ও বলা হয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণী : গিনিপিগ (Guineapig) পরিচিত এবং গৃহপালিত স্তন্যপায়ী প্রাণী। নিচে গিনিপিগের বাহ্য গঠন আলোচনা করা হল।

মস্তক, গ্রীবা ও দেহকাণ্ড— এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত গিনিপিগের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। এরা লম্বায় 20 সেন্টিমিটার



38 নং চিত্র— গিনিপিগের বাহ্য গঠন।

পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের মাথার সামান্য অংশ এবং পায়ের নিচের তল ছাড়া, দেহের সমস্ত অংশ **লোম** দিয়ে ঢাকা।

গিনিপিগের **মস্তক** বা **মাথা** লম্বা ধরনের। মাথার সামনের দিকে মুখ থাকে। **উর্ধ্বোষ্ঠ** এবং **নিম্নোষ্ঠ** দিয়ে মুখ সুরক্ষিত। উর্ধ্বোষ্ঠ মাঝখানে চেরা। উর্ধ্বোষ্ঠের উপরের দিকে পাশাপাশি দুটি **নাসারন্ধ্র** থাকে। উর্ধ্বোষ্ঠের দুপাশে কয়েকটি বড় বড় শক্ত লোম দেখা যায়। এগুলিকে **গুম্ফ** বলে। মাথার প্রতি পাশে একটি করে **চক্ষু** বা **চোখ** এবং প্রত্যেকটি চোখের উপরে ও নিচে যথাক্রমে **উর্ধ্ব-নেত্রপল্লব** এবং **নিম্ন-নেত্রপল্লব** থাকে। এদের উপপল্লব ক্ষয়প্রাপ্ত এবং চোখের ভিতরের কোণের দিকে থাকায়, সহজে দেখা যায় না। চোখের কিছুটা পিছনে **কর্ণছত্র** থাকে। এর গোড়ায় একটি ছোট গর্ত থাকে। গর্তটিকে **কর্ণকুহর** বলে। গিনিপিগের গ্রীবা খুব ছোট।

দেহকাণ্ড বা ধড়ের সামনের দিকে, নিচের অংশ **বুক** বা **বক্ষ** এবং বুকের পরের অংশ **পেট** বা **উদর**। বুক এবং পেটের থেকে যথাক্রমে একজোড়া করে **অগ্রপদ** এবং **পশ্চাৎ-পদ** বের হয়।

ব্যাঙের মতো, গিনিপিগেরও অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। অগ্রপদে চারটি এবং পশ্চাৎ-পদে তিনটি করে নখর-যুক্ত **অঙ্গুলি** বা **আঙুল** থাকে। পেটের নিচের দিকে দুটি **স্তনবৃন্ত** এবং ধড়ের শেষপ্রান্তে **পায়ু** থাকে।

পুরুষ-গিনিপিগের পায়ুর সামনে ছোট নলের মতো **পুং-জননেন্দ্রিয়**, এবং তার গোড়ায় থলির মতো একটি **অণ্ডকোষ** থাকে। স্ত্রী-গিনিপিগের পায়ুর সামনে পর পর দুটি ছিদ্র দেখা যায়। এদের মধ্যে বড় ছিদ্রটিকে ভাল্‌ভা (**Vulva**), এবং ছোটটিকে **মূত্র-ছিদ্র** বলে। ভাল্‌ভার সামনে একটি মাংসল অংশ থাকে। এই অংশকে **ক্লাইটরিস** (**Clitoris**) বলে।

আরসোলা ঃ সচরাচর দুরকমের আরসোলা পশ্চিমবঙ্গের গৃহস্থালির অন্যতম উপদ্রব। দুরকম আরসোলার মধ্যে একটি

আকারে বড়, অন্যটি ছোট। এখানে বড় আরসোলার বাহ্য গঠন আলোচনা করা হল।

আরসোলা উপর-নিচে চাপা, লম্বাটে পতঙ্গ— লম্বায় প্রায় 5 সেন্টিমিটার। এর দেহ গাঢ় বাদামী রঙের আবরণ দিয়ে ঢাকা। আরসোলার দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং **মস্তক**, **বক্ষ** ও **উদর** — এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

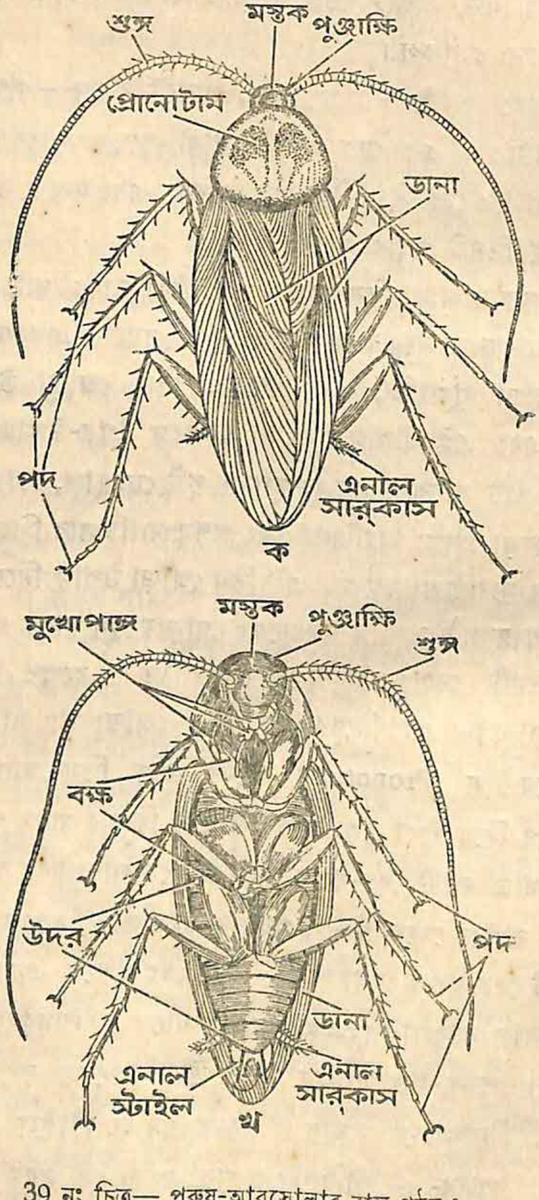
মস্তক বা মাথা তিন-কোণা এবং 'গ্রীবা' নামে ছোট একটি অংশের মাধ্যমে বক্ষ বা বুকের সঙ্গে জোড়া। মাথায় একজোড়া **শুঙ্গ** ও একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি**, এবং আরও তিন জোড়া **উপাঙ্গ** থাকে। শুঙ্গ এবং এই উপাঙ্গগুলিকে একসঙ্গে **শির-উপাঙ্গ** বলা হয়। শুঙ্গে গাঁট থাকে। মুখের দুপাশে দুটি **চোয়াল**, চোয়ালের পিছনে একজোড়া **প্রথম ম্যাক্সিলা** এবং প্রথম ম্যাক্সিলার পিছনে একজোড়া **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা** থাকে। এই তিন জোড়া উপাঙ্গ নিয়ে আরসোলার **মুখোপাঙ্গ** গঠিত। মুখোপাঙ্গের গোড়ায় **মুখ** থাকে।

তিনটি দেহ-খণ্ডক নিয়ে বক্ষ গঠিত। বক্ষের উপরের দিকে দুজোড়া **ডানা** এবং নিচের দিকে তিন জোড়া পা বা পদ থাকে। **প্রোনোটাম (Pronotum)** নামের প্রায় তিন-কোণা একটি শক্ত আবরণ দিয়ে গ্রীবা এবং বক্ষের উপরের দিকের প্রথম অংশ ঢাকা।

মোট দশটি দেহ-খণ্ডক নিয়ে আরসোলার উদর বা পেট গঠিত ; কিন্তু বাইরে থেকে স্ত্রী- ও পুরুষ-আরসোলার উদরে যথাক্রমে সাতটি ও নটি দেহ-খণ্ডক দেখা যায়। শেষ দেহ-খণ্ডকে একজোড়া **পায়ুকুর্চ** বা **এনাল সার্সাই (Anal cerci)*** থাকে। পায়ুকুর্চের কাছে থাকে পায়ু। পুরুষ-আরসোলার নবম উদর-খণ্ডকের দুপাশে আরও দুটি গাঁট-বিহীন কুর্চ দেখা যায়। এদের **এনাল স্টাইল (Anal styles)** বলে। পুরুষ- ও স্ত্রী-আরসোলার যথাক্রমে নবম ও সপ্তম উদর খণ্ডকের নিচের তলে **জনন-ছিদ্র** থাকে।

---

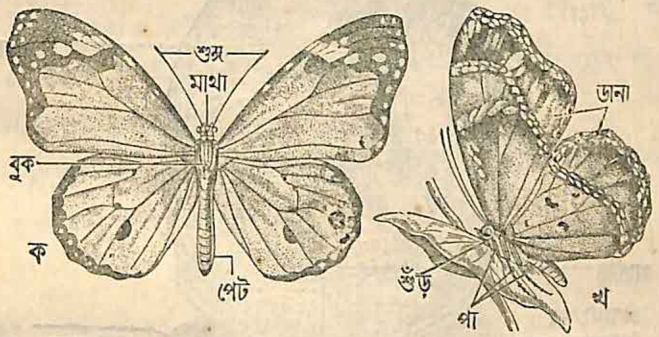
* বহুবচন ; এনাল সার্কাস (Anal cercus)— একবচন।



39 নং চিত্র— পুরুষ-আরসোলার বাহ্য গঠন :
ক. উপরের দিকের দৃশ্য ; খ. নিচের দিকের দৃশ্য।

প্রজাপতি ঃ প্রজাপতিও আরসোলার মতো আর এক ধরনের পতঙ্গ। এরা প্রায় 4 সেন্টিমিটার লম্বা। এদের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়-ভাবে প্রতিসম এবং **মস্তক** বা **মাথা, বক্ষ** বা **বুক** ও **উদর** বা **পেট** — এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

প্রজাপতির মাথার সামনের দিকে একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** এবং সরু দণ্ডের মতো **শুঙ্গ** থাকে। প্রজাপতির বিভিন্ন মুখোপাঙ্গ একসঙ্গে একটি ফাঁপা চোষক নল গঠন করে। এই নলকে **শুঙ্গ** বা **শুঁড়** বলা



40 নং চিত্র— প্রজাপতির বাহ্য গঠন ঃ ক. উপরের দিকের দৃশ্য ; খ. পাশের দিকের দৃশ্য।

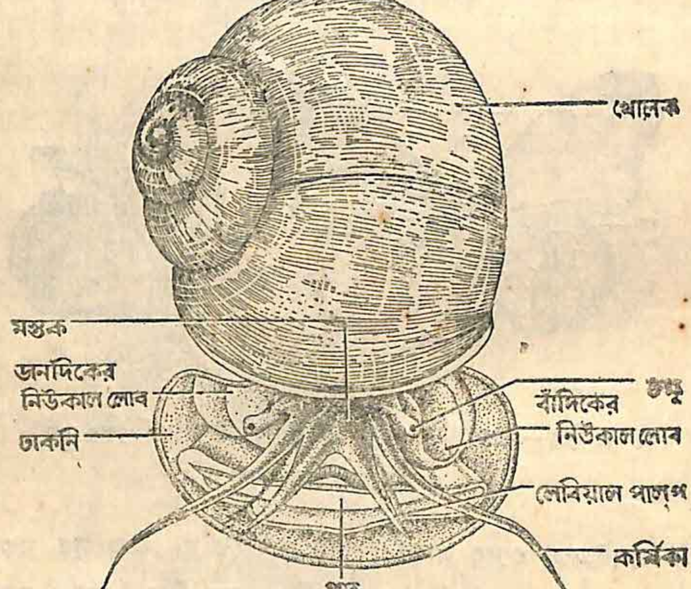
হয়। সেইজন্য, এদের আলাদা চোয়াল থাকে না। ফুলের মকরন্দ শোষণ করার সময় শুঁড়টি লম্বালম্বি বিস্তৃত হয়, কিন্তু বিশ্রাম-অবস্থায় নলটি ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো গুটানো থাকে।

তিনটি দেহ-খণ্ডক নিয়ে প্রজাপতির বুক গঠিত। ছোট ছোট রোম দিয়ে ঢাকা থাকায়, দেহ খণ্ডকগুলি সহজে দেখা যায় না। বুকের নিচের দিকে তিন জোড়া **পা**, এবং উপরের দিকে দুজোড়া রঙ-বেরঙের **ডানা** থাকে। ডানায় খুব গুঁড়া গুঁড়া আঁশ থাকে। বসার সময় প্রজাপতি ডানাগুলিকে খাড়াভাবে উপরের দিকে তুলে রাখে (40 নং চিত্র-খ)।

দশটি দেহ-খণ্ডক নিয়ে প্রজাপতির পেট গঠিত।

শামুক **ঃ** পশ্চিমবঙ্গে ছোট-বড় নানারকম শামুক জলে ও ডাঙায় দেখা যায়। এদের মধ্যে জলের বড় শামুক বা আপেল-শামুক (**Apple snail**) বেশি পরিচিত। এরা দেখতে কতকটা আপেলের মতো। এখানে আপেল-শামুকের বাহ্য গঠন বর্ণনা করা হল।

আপেল-শামুকের দেহ **অপ্রতিসম** এবং **মস্তক** বা **মাথা**, **পদ** ও **আন্তরযন্ত্রীয় পিণ্ড**— এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।



41 নং চিত্র— আপেল-শামুকের বাহ্য গঠন।

স্বাভাবিক অবস্থায়, আন্তরযন্ত্রীয় পিণ্ড একটি **খোলক**-এর মধ্যে, এবং মস্তক ও পদ খোলকের বাইরে থাকে। কোনও কারণে উত্তেজিত হলে, শামুক গোটা দেহকে খোলকের মধ্যে গুটিয়ে নেয় এবং **ঢাকনি**-র সাহায্যে খোলকের মুখ বন্ধ করে দেয়। খোলকটি প্রায় গোলাকার এবং শক্ত। এর গায়ে সাড়ে ছটি প্যাঁচ থাকে। খোলকের রঙ হলুদ, বাদামী অথবা কালো।

মস্তকের সামনের অংশকে তুণ্ড বলে। তুণ্ডের দুপাশে দুটি,

লেবিয়াল পাল্প (Labial pulp) নামক প্রলম্বিত শঙ্কুর মতো অংশ থাকে। লেবিয়াল পাল্প দুটির পিছনের দিকে মোটা সুতার মতো দুটি কর্ষিকা দেখা যায়। কর্ষিকার গোড়ায় একটি করে সবৃন্তক চক্ষু বা চোখ থাকে। মস্তকের সামনের অংশে, নিচের দিকের মধ্যরেখা-বরাবর চেরা মুখ থাকে।

পদের উপরে, মস্তকের দুপাশে দুটি মাংসল ভাঁজ দেখা যায়। এই ভাঁজগুলিকে **নিউকাল লোব** (Nuchal lobe) বলে। বাঁদিকের নিউকাল লোবটি ডানদিকেরটির চেয়ে বড়। ডানদিকের নিউকাল লোবের কিনারার কাছে পায়ু থাকে। পায়ুর অল্প পিছনে, জনন-পিড়কা নামে একটি অল্প উঁচু জায়গার মধ্যে একটি চেরা ছিদ্র থাকে। এটি শামুকের **জনন-ছিদ্র**।

শামুকের পদ নিচের দিকে থাকে। পদ তিন-কোণা এবং মাংসল। পদে ঢাকনিটি লাগানো থাকে।

অনুশীলনী

1. ছবি এঁকে, প্রধান মূলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।
2. স্থানিক মূল ও অস্থানিক মূলের পার্থক্য কি? উদাহরণ দাও।
3. খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে এইরকম দুটি মূলের ছবি এঁকে বর্ণনা কর।
4. ঝুরিমূল কাকে বলে? ঝুরিমূলের সঙ্গে ঠেশমূলের পার্থক্য কি?
5. ছবি এঁকে, কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর।
6. তিনটি মৃদ্গত কাণ্ডের ছবি এঁকে, তাহাদের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
7. গ্রন্থিকাণ্ড কি? ছবি এঁকে, এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
8. তোমাকে উদ্ভিদের একটি মৃদ্গত অংশ দেওয়া হল। বাইরে থেকে দেখে, ঐটি মূল কি কাণ্ড, তা কিভাবে চিনবে?
9. একটি পত্রের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
10. একক পত্র ও যৌগপত্রের ছবি এঁকে, এদের পার্থক্য লেখ।
11. তিনটি পরিবর্তিত পত্রের ছবি এঁকে, বর্ণনা কর।
12. একটি পুষ্পের ছবি এঁকে, তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
13. সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুষ্প কি? প্রতিটির দুটি করে নাম লেখ।
14. তিনটি সরস ও তিনটি নীরস ফলের ছবি এঁকে, বর্ণনা কর।

15. ছবি এঁকে, মটর-বীজের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

16. সস্যল বীজ কি? একটি সস্যল বীজের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

17. আম, ধান, মটরশুঁটি, লেবু, চালতা — কোন্‌টি কোন শ্রেণীর ফল, বল। এইসব ফলের কোন কোন অংশ আমরা খাই, তা উল্লেখ কর।

18. রুই মাছের বাহ্য গঠন বর্ণনা কর। এর চিহ্নিত ছবি আঁক।

19. টিকটিকির বাহ্য গঠন বর্ণনা কর।

20. তোমার পরিচিত যে-কোনও একটি পাখির বাহ্য গঠন বর্ণনা কর।

21. শামুকের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

22. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক তার পাশে **হ্যাঁ**, এবং যেটি ভুল তার পাশে **না** লেখ :—

(ক) সমস্ত একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল থাকে। (খ) গুচ্ছমূল এক ধরনের অস্থানিক মূল। (গ) খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা ঝুরিমূলের কাজ। (ঘ) গোল-আলুর মৃদ্গত কাণ্ডকে গ্রন্থিকাণ্ড বলে। (ঙ) শাখা-কণ্টক একধরনের পরিবর্তিত কাণ্ড। (চ) কুমড়াগাছে উভলিঙ্গ পুষ্প হয়। (ছ) রজনী-গন্ধা এক ধরনের অসম্পূর্ণ পুষ্প। (জ) গোলাপগাছের পত্র একক পত্র। (ঝ) পত্রকণ্টক পরিবর্তিত কাণ্ড। (ঞ) ধান এক ধরনের সরস ফল। (ট) আমের ফলকে ড্রুপ বলে। (ঠ) মটর-বীজ একটি সস্যল বীজ। (ড) রুই মাছের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। (ঢ) টিকটিকির পিঠের দিকে প্যারোটিয়েড গ্রন্থি থাকে। (ণ) আরসোলার উদরের শেষ দেহ-খণ্ডকে পায়ুকূর্চ থাকে। (ত) পায়রার চঞ্চুতে ছোট ছোট দাঁত থাকে। (থ) গিনিপিগের উদরের অঙ্কদেশে দুটি স্তনবৃন্ত থাকে। (দ) শামুকের দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। (ধ) প্রজাপতির দেহ মাথা, বুক ও আন্তরযন্ত্রীয় পিণ্ড নিয়ে গঠিত।

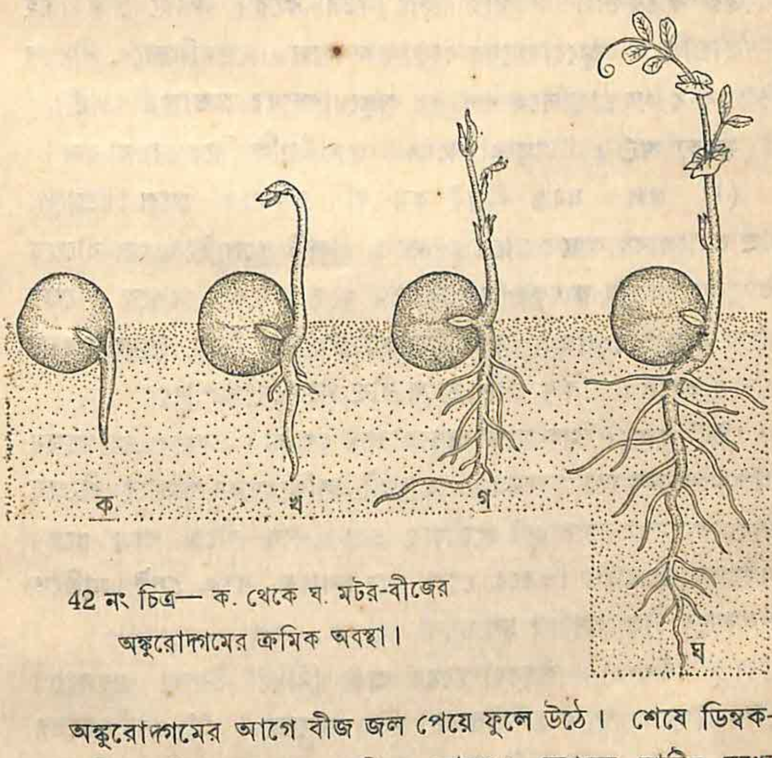
23. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) পত্রাশয়ী মূল এক ধরনের — মূল। (খ) মূলার মূলকে — বলে। (গ) ঝুমকালতার শাখা-আকর্ষ এক ধরনের — —। (ঘ) মটরফুলের —টি পুংকেশরের মধ্যে—টি জোড়া এবং —টি আলাদা থাকে। (ঙ) কাঁঠাল এক ধরনের — ফল। (চ) জবাপাতায় — শিরাবিন্যাস দেখা যায়। (ছ) সরিষার ফলকে — বলে। (জ) —দ্বিবীজপত্রী সস্যল বীজের উদাহরণ। (ঝ) রুই মাছের দুজোড়া — পাখনা এবং — টি অযুগ্ম পাখনা আছে। (ঞ) কুনো ব্যাঙের চোখ —, — এবং — এই তিনটি পর্দা দিয়ে সুরক্ষিত থাকে। (ট) পায়রার পুচ্ছে — টি পালক থাকে। (ঠ) আরসোলার মাথার সামনের দিকে একজোড়া — ও একজোড়া — থাকে।

বীজের অঙ্কুরোদগম

3

বীজ পাকার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পুঁতে দিলে, অনেক সময় অঙ্কুর বের হয় না ; কারণ, এই সময় বীজের **সুপ্ত অবস্থা**। নানা বীজের সুপ্ত অবস্থা নানারকম – কারও কম, আবার কারও বেশি। নির্দিষ্ট সময় পরে, অনুকূল পরিবেশে, অর্থাৎ পরিমিত জল, উষ্ণতা, বায়ু ইত্যাদির প্রভাবে বীজের সুপ্ত অবস্থা চলে যায়। তখন বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয়। **বীজ থেকে অঙ্কুর বের হওয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে।**



42 নং চিত্র— ক. থেকে ঘ. মটর-বীজের অঙ্কুরোদগমের ক্রমিক অবস্থা।

অঙ্কুরোদগমের আগে বীজ জল পেয়ে ফুলে উঠে। শেষে ডিম্বক-রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে ভ্রূণমূল বেরিয়ে আসে। ভ্রূণমূল মাটির মধ্যে প্রাথমিক মূল গঠন করে। ইতিমধ্যে ভ্রূণমুকুল বেরিয়ে আসে এবং

বেঁকে মাটির উপরে উঠে, কাণ্ড গঠন করে। এইভাবে, প্রাথমিক মূল ও কচি কাণ্ড মিলে, শিশু উদ্ভিদ বা চারাগাছ সৃষ্টি হয়।

তেঁতুল, কুমড়া, পিঁয়াজ প্রভৃতি বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজত্বক্ ফেটে, বীজপত্র মাটির উপরে চলে আসে। কাণ্ডের গায়ে বীজপত্র অনেকদিন পর্যন্ত লেগে থাকে। এই ধরনের অঙ্কুরোদ্গমকে **মৃদ্‌ভেদী অঙ্কুরোদ্গম** বলে। নারিকেল, ছোলা, মটর, আম, পদ্ম, ধান ইত্যাদির ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের মধ্যে, এবং বীজ মাটির ভিতরে থেকে যায়। এইরকম অঙ্কুরোদ্গমকে **মৃদ্‌বর্তী অঙ্কুরোদ্গম** বলা হয়।

অঙ্কুরোদ্গমের শর্ত ঃ বীজের অঙ্কুরোদ্গম পরিবেশের এবং বীজের কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। পরিবেশের এই অবস্থাগুলিকে অঙ্কুরোদ্গমের বাহ্য শর্ত বলে। তেমনিভাবে, বীজের ভিতরকার অবস্থাগুলিকে বলা হয় অঙ্কুরোদ্গমের **অভ্যন্তরীণ শর্ত**।

বাহ্য শর্ত ঃ অঙ্কুরোদ্গমের বাহ্য শর্তগুলি নিচে দেওয়া হল।

(1) জল— সমস্ত বীজই কম-বেশি শুক্‌না। জলে ভিজালে, বীজ জলশোষণ করতে থাকে। ফলে, বীজটি ফুলে উঠে এবং বীজের ভিতরের অবস্থার কতকগুলি পরিবর্তন হতে থাকে। শেষে বীজের খোসা নরম হয়ে যায়। তখন ডিম্বকরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ভ্রূণমূল সহজে বেরিয়ে আসে। কিন্তু, বেশি জলে বীজ পচে যেতে পারে।

(2) বায়ু— বায়ু ছাড়া অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বায়ুর অক্সিজেন বীজের শ্বসনের জন্য দরকার। কাজেই, অক্সিজেনের অভাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং শেষে বীজে পচন ধরে। সেইজন্য, যে মাটির ভিতরে বেশ বায়ু চলাচল করে, সেই মাটিতে ভালভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয়।

(3) উষ্ণতা— অঙ্কুরোদ্গমের জন্য নির্দিষ্ট উষ্ণতা দরকার। বিভিন্ন বীজের ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা বিভিন্ন রকমের। 5° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে কম এবং 48° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি উষ্ণতায় সাধারণতঃ অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তবে, 25° থেকে 30° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা

অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে সবচেয়ে ভালো এবং বেশির ভাগ বীজই এই উষ্ণতার মধ্যে ভালভাবে অঙ্কুরিত হয়।

(4) আলো— সাধারণতঃ বেশির ভাগ বীজ অন্ধকারে ভালভাবে অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু তামাক, পালং প্রভৃতি কয়েকটি বীজ আলো ছাড়া একেবারেই অঙ্কুরিত হয় না। সেইজন্য, আলো অঙ্কুরোদ্গমের আর একটি বাহ্য শর্ত।

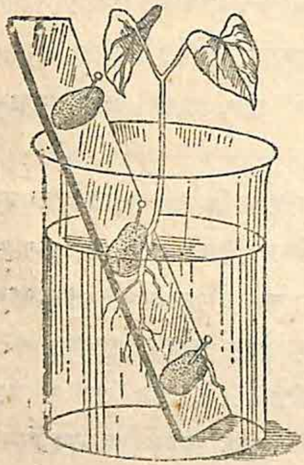
অভ্যন্তরীণ শর্ত ঃ বীজের বীজপত্রে কিংবা সস্যে খাদ্য জমা থাকে। অঙ্কুরোদ্গমের সময় এই সঞ্চিত খাদ্যের সাহায্যে ভ্রূণ পুষ্ট হয়। কাজেই, ভালভাবে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বীজে যথেষ্ট খাদ্য থাকা দরকার। বীজের **অঙ্কুরোদ্গম-ক্ষমতা** আর একটি প্রধান শর্ত। যদিও পুষ্ট বীজে ভ্রূণ অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তবু ভ্রূণ নষ্ট হয়ে গেলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম-ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। অনেকদিনের পুরানো বীজ স্বাভাবিকভাবেই অঙ্কুরোদ্গম-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পোকা-মাকড়ের আক্রমণেও ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়। এইরকম বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না।

অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা ঃ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য যে জল, অক্সিজেন (বায়ু) এবং উপযুক্ত উষ্ণতা দরকার, একটি সাধারণ পরীক্ষায় তা প্রমাণ করা যায়। এই পরীক্ষাটিকে সচরাচর **তিন বীনের পরীক্ষা** বলে। নিচে পরীক্ষাটি বর্ণনা করা হল।

উপকরণ— পরীক্ষার জন্য লাগবে তিনটি পুষ্ট বীনের বীজ, একটি বড় এক-লিটার বীকার (Beaker), একটি লম্বা ও নরম কাঠ, তিনটি লম্বা আল্‌পিন, প্রায় আধ-লিটার ফুটিয়ে-ঠাণ্ডা-করা জল এবং কিছুটা গলা মোম।

পরীক্ষা— প্রথমে কাঠের টুকরাটির গায়ে ভাল করে গলা মোমের প্রলেপ লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর, তিনটি বীজ কাঠের টুকরার উপর আল্‌পিন দিয়ে উপরে, মাঝে ও নিচে সমান দূরত্বে গেঁথে দিতে হবে। পিন গাঁথার সময় যাতে ভ্রূণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখন বীজসহ ঐ কাঠের টুকরাটি কাত করে

বীকারের ভিতরে রাখতে হবে। বীকারে এমনভাবে জল ঢালতে হবে, যাতে নিচের বীজটি পুরাপুরি এবং মাঝের বীজটি কিছুটা জলে ডুবে থাকে। এইভাবে বীকারটি ঘরের স্বাভাবিক উষ্ণতায় কয়েক দিন রেখে দিতে হবে।



43 নং চিত্র— তিন বীনের পরীক্ষা।

নিরীক্ষা— কয়েকদিন পরে দেখা যাবে, কাঠের মাঝখানের বীজটি স্বাভাবিকভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে, নিচের বীজটি খুব অল্প অঙ্কুরিত হয়েছে, কিন্তু উপরের বীজটি আদৌ অঙ্কুরিত হয় নি।

সিদ্ধান্ত—কাঠের মাঝখানের বীজটি পরিমাণমতো জল, উষ্ণতা এবং অক্সিজেন পেয়েছিল বলে, স্বাভাবিকভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে। কাঠের নিচের দিকের অর্থাৎ জলে-ডুবে-থাকা বীজটি জল ও উষ্ণতা পাওয়ায়, কিছুটা অঙ্কুরিত হয়েছে ; কিন্তু, অক্সিজেনের অভাবে ভালভাবে অঙ্কুরিত হয়নি। উপরের বীজটি পরিমিত অক্সিজেন ও উষ্ণতা পাওয়া সত্বেও, জলের অভাবে অঙ্কুরিত হতে পারেনি। তাই এই পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল, অঙ্কুরোদ্গমের জন্য জল, উষ্ণতা ও বায়ু দরকার।

অনুশীলনী

1. মৃদ্ভেদী অঙ্কুরোদ্গম কাকে বলে? মৃদভেদী অঙ্কুরোদ্গম হয় এমন দুটি বীজের নাম কর।
2. মৃদ্বর্তী অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে মৃদ্ভেদী অঙ্কুরোদ্গমের পার্থক্য কি?
3. অঙ্কুরোদ্গমের সময় জল, বায়ু ও উষ্ণতা চাই, পরীক্ষা করে দেখাও।
4. অঙ্কুরোদ্গমের প্রয়োজনীয় তিনটি বাহ্য শর্ত আলোচনা কর।

5. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে **হ্যাঁ** এবং যেটি ভুল, তার পাশে **না** লেখ :—

(ক) মৃদ্বর্তী অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজপত্র দুটি মাটির উপর চলে আসে। (খ) মটর-বীজে মৃদ্বর্তী অঙ্কুরোদ্গম হয়। (গ) জল ও বায়ু অঙ্কুরোদ্গমের দুটি অভ্যন্তরীণ শর্ত। (ঘ) সমস্ত বীজেরই অঙ্কুরোদ্গমের সময় আলো দরকার।

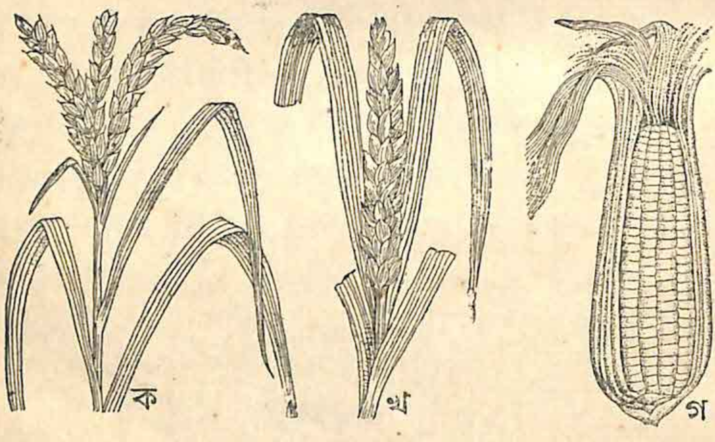
6. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) অঙ্কুরোদ্গমের সময় — ভিতর দিয়ে প্রথমে — বেরিয়ে আসে। (খ) —, — ও — অঙ্কুরোদ্গমের তিনটি প্রয়োজনীয় বাহ্য শর্ত। (গ) বেশির ভাগ বীজ — অঙ্কুরিত হয়। (ঘ) — বীজের অঙ্কুরোদ্গমের একটি অভ্যন্তরীণ শর্ত।

কয়েকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণী | 4

খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য— এই কটি প্রধান সমস্যা মিটানের জন্য মানুষকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের উপর কম-বেশি নির্ভর করতে হয়। কাজেই, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গুরুত্ব খুব বেশি। যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ-জাত দ্রব্য মানুষের প্রয়োজনে লাগে, সেই উদ্ভিদ ও প্রাণীকে **অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ** উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী হিসাবে ধরা হয়। নিচে এইরকম কয়েকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

খাদ্যশস্য ঃ ধান, যব, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতিকে খাদ্য-শস্য বলা হয়। উদ্ভিদের মধ্যে খাদ্যশস্য সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। এরা একবীজপত্রী **বীরুৎ**-শ্রেণীর উদ্ভিদ। এদের কাণ্ড খুব নরম, এক থেকে দুমিটার লম্বা, সাধারণতঃ ফাঁপা এবং পত্রমূল দিয়ে ঢাকা।



44 নং চিত্র— প্রধান তিন রকম খাদ্যশস্য ঃ ক. ধান ; খ. গম ; গ. ভুট্টা।

পত্র বেশ লম্বা ও সরু হয়। পরিণত উদ্ভিদের ডগায় **শীষ** দেখা যায়। শীষ আসলে বিশেষ ধরনের পুষ্পবিন্যাস। শীষের গায়ে ক্যারিওপ্‌সিস শ্রেণীর ফল ধরে। শীষ থেকেই খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। এরা মাত্র কয়েক মাস বাঁচে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে পুষ্প, ফল ও বীজ উৎপন্ন করে,

মরে যায়। সেইজন্য, এদের **বর্ষজীবী উদ্ভিদ** বলা হয়। এখানে কয়েকটি খাদ্য-শস্যের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ধান ঃ ভারতে ধানের চাষ সবচেয়ে বেশি হয় পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম ও তামিল নাড়ুতে। ভারতে তিন রকমের ধান চাষ করা হয়— **আউশ, আমন** ও **বোরো**।

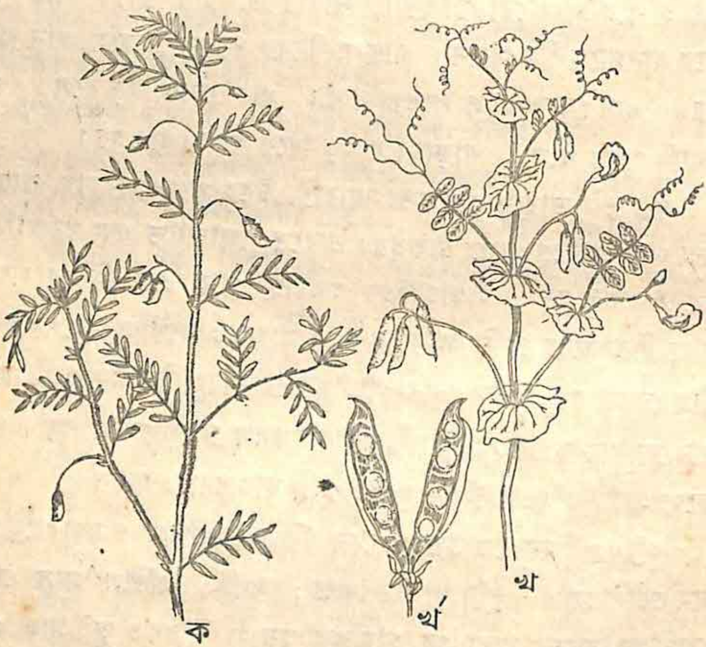
ধান-চাষের জন্য মাটিতে কুড়ি-পঁচিশ সেন্টিমিটার জল থাকা দরকার। বীজ বোনার এক সপ্তাহ পর অঙ্কুর বের হয়। চার-পাঁচ সপ্তাহ পরে চারা রোওয়া হয়। সাধারণতঃ চার থেকে পাঁচ মাস পরে ধানগাছে শীষ আসে। গাছ ও শীষের রঙ হল্‌দে হলে, ধান কাটা হয়। ধান থেকে চা'ল পাওয়া যায়। ধানগাছকে খড় বলে। খড় গবাদি পশুর খাদ্য। পাড়াগাঁয়ে খড় দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়।

গম ঃ ভারতে প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব এবং মধ্য প্রদেশে গমের চাষ হয়। ভারতে **লম্বাজাতি** এবং **খর্বজাতির** গম চাষ করা হয়। লম্বাজাতির গমগাছ প্রায় এক মিটার লম্বা। খর্বজাতির গমের বেশি ফলন হয়। সাধারণতঃ অক্টোবরের শেষাশেষি বীজ বোনা হয়। চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে শীষ আসে। ফসল পাকলে, গম কাটা হয় এবং শীষ থেকে ফসল ঝেড়ে তোলা হয়। পরে কলে অথবা জাঁতায় পিষে আটা, সুজি বা ময়দা করা হয়।

ভুট্টা ঃ ভারতে উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে ভুট্টা চাষ বেশি হয়। ভুট্টা খারিফ শস্য ; অর্থাৎ, এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এর চাষ করা হয়। পরিণত ভুট্টাগাছ প্রায় দুমিটার লম্বা। ভুট্টার পুষ্প একলিঙ্গ। কাণ্ডের শীর্ষে যে শীষ উৎপন্ন হয়, তাতে পুং-পুষ্প থাকে। পত্রের কক্ষে উৎপন্ন এক বিশেষ ধরনের পুষ্পবিন্যাসে স্ত্রী-পুষ্প জন্মায়। স্ত্রী-পুষ্পবিন্যাস শঙ্কুর মতো এবং মঞ্জরীপত্র দিয়ে ঢাকা। মঞ্জরীর এই পুষ্পবিন্যাসের উপরের দিক থেকে পুষ্পের গর্ভদণ্ডগুলি রেশম সুতার মতো গুচ্ছাকারে বেরিয়ে থাকে। ভুট্টা থেকে খৈ, কর্‌নফ্লেক্‌স (Corn flaeks) ইত্যাদি তৈরী হয়।

ডা'ল ঃ মসুর, মুগ, ছোলা, খেসারি, মটর, অড়হর, বরবটি প্রভৃতি ডা'ল রবিশস্যের অন্তর্গত। অর্থাৎ, অক্টোবর মাস থেকে মার্চ মাসের মধ্যে এদের চাষ করা হয়। বরবটি প্রভৃতি কয়েকটি ডা'ল রবি ও খারিফ দুই ঋতুতেই চাষ হয়। ডা'লে গড়ে শতকরা 30 ভাগ প্রোটীন থাকায়, এর খাদ্যমূল্য খুব বেশি।

সমস্ত ডা'ল দ্বিবীজপত্রী শিম্বি-জাতীয় উদ্ভিদ ; অর্থাৎ, এদের সকলেরই শিম্ব-জাতীয় ফল হয়। সমস্ত ডা'লগাছেরই যৌগপত্র থাকে। কতকগুলি ডাল'গাছ লতানে ; যেমন— মটর।



45 নং চিত্র— ক. মসুর ; খ. মটর ; খ'. মটরের শিম্ব (বিদারিত)।

উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মসুর ডা'লের বীজ বোনা হয়। প্রায় সাড়ে তিন মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসে। পরিণত মসুরগাছ প্রায় 60 থেকে 75 সেন্টিমিটার লম্বা। কাণ্ডের কক্ষে একটি অথবা দুটি সাদা অথবা গোলাপী রঙের পুষ্প জন্মায়। এদের শিম্ব 1 থেকে 1·5 সেন্টিমিটার লম্বা হয়। প্রতিটি শিম্বে দুটি করে বীজ থাকে।

মটর শীতের পরিচিত সব্জি। সাধারণতঃ জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে মটরগাছে ফল ধরে। ফল শুকিয়ে গেলে, বীজগুলি ডা'ল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বিহার, মধ্য প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে খেসারির চাষ শুরু হয়। পরিণত খেসারিগাছ সাধারণতঃ 1·2 মিটার লম্বা। শিম্ব লম্বায় সাধারণতঃ 2·5 থেকে 2·7 সেন্টিমিটার। প্রতিটি শিম্বে চার-পাঁচটি বীজ থাকে। বীজ বাদামী রঙের। খেসারিগাছ গবাদি পশুর খাদ্য।

উপরে যে সব ডা'লের কথা বলা হল, সেগুলি ছাড়া অড়হর, মুগ, কলাই প্রভৃতি ডা'ল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত চাষ করা হয়।

পাট ঃ পাট তন্তু-উৎপাদী উদ্ভিদ এবং ভারতের অন্যতম কৃষিজাত দ্রব্য। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। প্রধানতঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় পাট চাষ করা হয়।

পাট দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। পরিণত পাটগাছ 2 থেকে 2·25 মিটার লম্বা। এর কাণ্ড সরু, এবং কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়। কাণ্ড থেকেই তন্তু পাওয়া যায়। পাটের পত্র ভল্লাকার এবং ফলকের কিনারা খাঁজ-কাটা। পত্রের কক্ষে একটি বা দুটি পুষ্প জন্মায়। ফল ক্যাপ্সুল-জাতীয়।



46 নং চিত্র— পাট।

ভারতে প্রধানতঃ দুরকম পাট চাষ করা হয়-- তিতা পাট ও

মিঠা পাট। পলিমাটিতে মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে পাটের বীজ বোনা হয়। জুন ও জুলাই মাসে পাট কাটা হয়।

পাট দিয়ে প্রধানতঃ দড়ি, চট ও বস্তা তৈরী হয়। পাটের দড়ি মজবুত ও শক্ত। তন্তু-নিষ্কাশনের পর কাণ্ডের অবশিষ্ট সরু অংশকে পাটকাঠি বলে। মিঠা পাটের কচি পাতা শাক হিসাবে খাওয়া যায়।

কার্পাস ঃ কার্পাসও তন্তু-উৎপাদী উদ্ভিদ। কার্পাস গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের উদ্ভিদ। কার্পাসগাছ থেকে তুলা পাওয়া যায়। পৃথিবীর একের চার ভাগ তুলা ভারতে উৎপন্ন হয়। ভারতের দক্ষিণ ভাগের



47 নং চিত্র— ক. ও খ. দুরকম কার্পাসগাছ ; ক. কার্পাস ফল ; খ´. কার্পাস ফলের মধ্যে তুলা।

কালো মাটিতে সবচেয়ে ভালো কার্পাস-চাষ হয়। সেইজন্য, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিল নাড়ুতে কার্পাসের চাষ বেশি হয়। ভারতে মোট চার জাতির কার্পাস চাষ করা হয়।

কার্পাস দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। কার্পাসগাছের গড় উচ্চতা দেড় থেকে দুমিটার। প্রধান কাণ্ড থেকে প্রচুর পরিমাণে শাখা-প্রশাখা উৎপন্ন হওয়ায়, গাছগুলিকে ঝোপের মতো দেখায়। পত্র বেশ চওড়া এবং তিন থেকে সাতটি খণ্ডে বিভক্ত। পুষ্পের রঙ সাদা, হলুদ কিংবা গোলাপী ; ফল ক্যাপ্‌সুল জাতীয়। বীজের চারপাশ থেকে বড় বড় ঘন রোম বের হয়। এই রোমই তুলা।

কার্পাস-চাষের জমিতে যথেষ্ট আর্দ্রতা থাকা দরকার। প্রধানতঃ বীজ থেকে চারাগাছ তৈরি করা হয় ; অবশ্য সময় সময় শাখা কেটে বংশবৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। বীজ পোঁতার 200 দিন পর গাছে ফুল ধরে এবং ফুল ফোটার চার সপ্তাহের মধ্যে তুলা হয়।

কার্পাসের তুলা থেকে সুতী-বস্ত্র তৈরী হয়। এছাড়া, কার্পাসের বীজ থেকে একরকম তেল পাওয়া যায়।

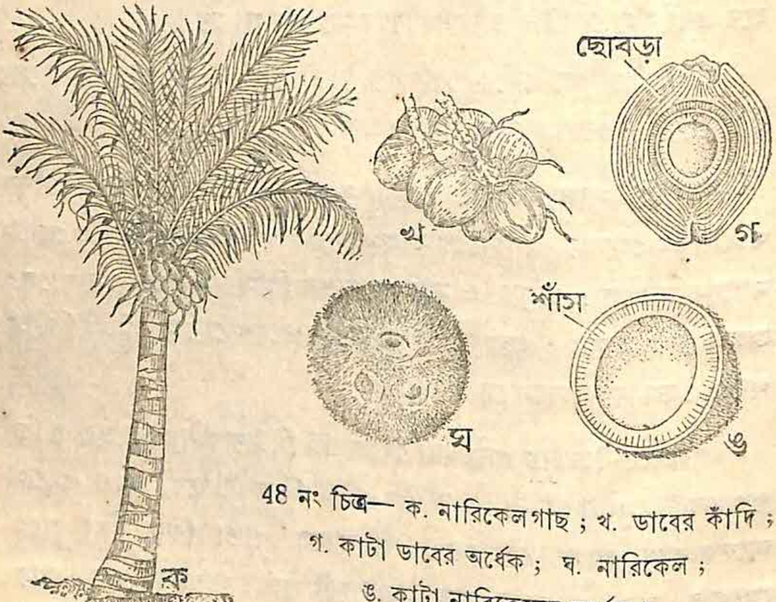
শাল ঃ শাল **কাষ্ঠউৎপাদী বৃক্ষ।** পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায় ; বিহারের রাজমহল, সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে ; ওড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘন শালের জঙ্গল দেখা যায়। এছাড়া হিমালয়ের পাদদেশ থেকে 1500 মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় শালবন দেখা যায়।

শালগাছ উচ্চতায় প্রায় 40 থেকে 45 মিটার। শালগাছের গুঁড়ি খুব একটা মোটা হয় না। মাটির বেশ কিছু উপরে, কাণ্ড থেকে অনেক শাখা প্রশাখা বের হয়। শীতকালে পাতা কিছু কিছু ঝরে গেলেও, সারা বৎসরই এদের মোটামুটি পাতা থাকে। পত্র প্রায় 20 সেন্টিমিটার লম্বা ও ডিম্বাকার ; নিচের তলের থেকে উপরের তল বেশি সবুজ ও চক্‌চকে। বল্কল ছাই-রঙের এবং চার-পাঁচ সেন্টিমিটার পুরু, খস্‌খসে ও লম্বালম্বি ফাটল-যুক্ত। সাধারণতঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শালগাছে ফুল ফোটে। পুষ্প খুব ছোট এবং হাল্‌কা গন্ধ-যুক্ত। চৈত্রের শেষাশেষি ফল পাকে। পরিণত ফলে বৃত্যংশগুলি ডানার মতো লেগে থাকে। সেইজন্য, শালের ফল বায়ুতে ভেসে

বহুদূরে ছড়িয়ে যায়। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার 15 থেকে 20 বৎসর পরে ব্যবহারের উপযোগী কাঠ পাওয়া যায়।

শালকাঠ বেশ মজবুত। এই কাঠ ঘর-বাড়ি ও কম দামী আসবাব-পত্র তৈরীর কাজে লাগে। শালপাতায় খাবার খাওয়া চলে। শালগাছের বন্কল থেকে ধুনা নিষ্কাশন করা হয়।

নারিকেল ঃ নারিকেল প্রধানতঃ **তৈল-উৎপাদী উদ্ভিদ**। নারিকেল উৎপাদনে ভারতের স্থান তৃতীয়। ভারতের কেরালা, তামিল নাড়ু, ওড়িষ্যার পুরী ও কটক জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মায়।



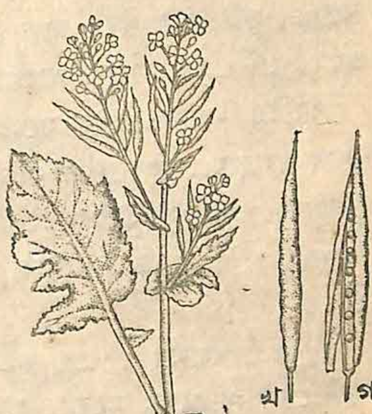
48 নং চিত্র— ক. নারিকেলগাছ ; খ. ডাবের কাঁদি ; গ. কাটা ডাবের অর্ধেক ; ঘ. নারিকেল ; ঙ. কাটা নারিকেলের অর্ধেক।

নারিকেল গাছ 25 থেকে 30 মিটার উঁচু, একবীজপত্রী বৃক্ষ-জাতীয় উদ্ভিদ। এর কাণ্ড প্রায় খাড়া ; কাণ্ডে শাখা জন্মায় না ; গুঁড়ির ব্যাস 30 থেকে 40 সেন্টিমিটার। কাণ্ডের শীর্ষে প্রায় তিন মিটার লম্বা পত্রগুলি মুকুটের মতো সাজানো থাকে। নারিকেল গাছ 80 থেকে 90 বৎসর পর্যন্ত বাঁচে।

বীজ পোঁতার 8 থেকে 10 বৎসর পরে নারিকেল গাছে প্রথম ফল ধরে। নারিকেলের ফল তন্তুময় ড্রুপ। সারা বৎসরই নারিকেল গাছে কম-বেশি ফলন হয়। অপরিণত নারিকেলকে ডাব বলে।

ডাবের জল উপাদেয়। নারিকেলও উপাদেয় খাদ্য এবং এর খাদ্যমান খুব উন্নতধরেনর। নারিকেল তেল ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে রান্নায় ব্যবহৃত হয়। নারিকেল থেকে তাড়ি ও ভিনিগার (Vinegar) তৈরী হয়। নারিকেলের খইল গবাদি পশুর খাদ্য। নারিকেলের তন্তুময় আবরণকে ছোবড়া বলে। ছোবড়া থেকে দড়ি, পাপোশ ইত্যাদি তৈরী হয়। ছোবড়া ও 'মালা' অর্থাৎ নারিকেলের কাষ্ঠল আবরণ খুব ভালো জ্বালানি। মালা থেকে হুঁকার খোল, জলপানের রকমারী পাত্র, বালা ও বোতাম তৈরী হয়।

সরিষা ঃ সরিষাও তৈল-উৎপাদী উদ্ভিদ। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে নিয়মিত সরিষার চাষ হয়। **হলুদ সরিষা, বাদামী সরিষা, টোরিয়া (Toria)** এবং **রাই সরিষা**—ভারতে এই চার জাতের সরিষার চাষ হয়। সরিষাও রবিশস্যের অন্তর্গত।



49 নং চিত্র – সরিষা ঃ ক. পুষ্পসহ কাণ্ড ; খ. ফল ; গ. বিদারিত ফল।

পরিণত সরিষাগাছ প্রায় এক মিটার লম্বা। এরা দ্বিবীজপত্রী, বর্ষজীবী, বীরুৎ-শ্রেণীর উদ্ভিদ। এর পত্র বেশ বড় এবং খণ্ডিত এবং দেখতে কতকটা বীণার মতো।

সাধারণতঃ হেমন্তকালে সরিষাগাছে ফুল ফোটে। সরিষার পুষ্পগুলি পুষ্পবিন্যাসে সাজানো থাকে। এদের পাপড়ির রঙ হলুদ। পাপড়ি চারটি পুষ্পাক্ষের উপর ক্রশের আকারে সাজানো থাকে। ফল সরু ও লম্বা এবং

সিলিক্যুয়া-শ্রেণীর। পরিণত ফলের ত্বক্ ফেটে বীজ বেরিয়ে আসে। বীজ বাদামী অথবা হাল্‌কা হলুদ রঙের।

সরিষা বীজে শতকরা 35 থেকে 50 ভাগ তেল থাকে। এই তেল প্রধানতঃ রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। সরিষার খইল গবাদি পশুর খাদ্য এবং সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই খইল মাছ-চাষেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

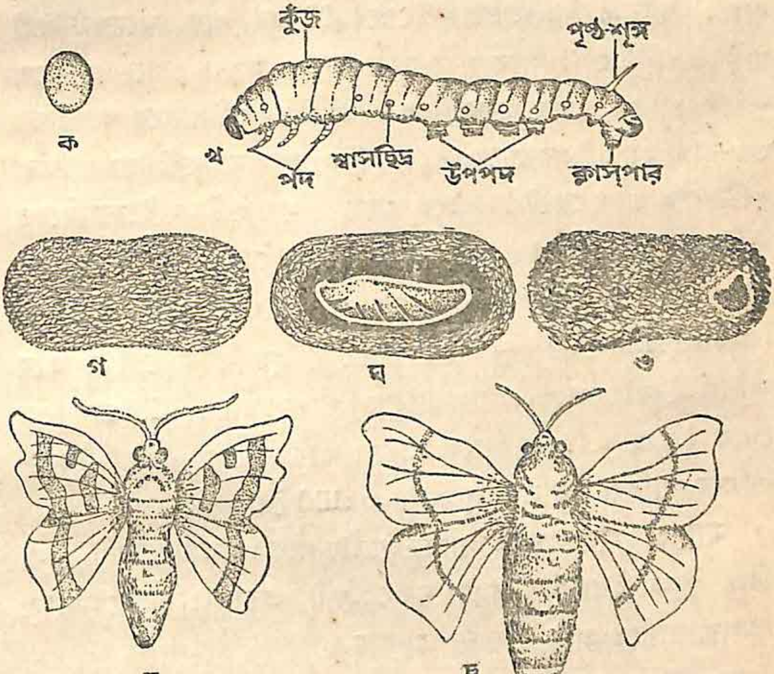
রেশম-কীট ঃ রেশম মথ প্রজাপতির মতো পতঙ্গ। এর ডিম থেকে বাচ্ছা মথ বের না হয়ে, শুঁয়াপোকার মতো দেখতে শূক বের হয়। রেশম মথের শূককে **রেশম-কীট** বলা হয়। এর দেহে **রেশম-গ্রন্থি** নামে গ্রন্থি থাকে। পরিণত রেশম-কীটের রেশম-গ্রন্থি থেকে একরকম আঠালো রস বের হয়। বায়ুর সংস্পর্শে এসে, ঐ রস শক্ত সুতায় পরিণত হয়। রেশম-কীট ঐ সুতা দিয়ে নিজের চারিদিকে একটি আবরণ তৈরি করে। এই আবরণকে **গুটি** বলে। গুটি তৈরি করে বলে, রেশম-কীটকে **গুটিপোকা**-ও বলা হয়। গুটি থেকে যে সুতা পাওয়া যায়, তাই-ই **রেশম**।

বিভিন্ন ধরনের রেশম মথের মধ্যে **তুঁত রেশম মথ**-এর গুটি থেকে সবচেয়ে ভালো রেশম পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় এবং আসাম, মেঘালয়, ওড়িষ্যা, তামিল নাড়ু, পাঞ্জাব, কর্ণাটক ও কাশ্মীরে রেশম-কীটের চাষ হয়।

তুঁত রেশম মথ দেখতে কতকটা প্রজাপতির মতো (তবে, শুঙ্গ দুটি ছোট পালকের মতো), হাল্‌কা রঙের এবং প্রসারিত ডানা-বরাবর 5 সেন্টিমিটার চওড়া। পুরুষ-মথ, স্ত্রী-মথের থেকে ছোট; স্ত্রী মথের পেট পুরুষ-মথের চেয়ে মোটা। শুঁড় না থাকায়, রেশম মথ খাদ্য গ্রহণ করে না। জন্মের দু-তিন দিন পর পুরুষ মথ মরে যায়। স্ত্রী-মথও ডিম পাড়ার পর মরে যায়।

স্ত্রী-মথ কাগজের কার্ডের উপর সরিষা-বীজের মতো দেখতে এককালীন 300 থেকে 400টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ধূসর রঙের।

ডিমসহ কাগজের কার্ডগুলি ডালায় রেখে দেওয়া হয় এবং ডালাগুলিকে হাওয়া চলাচল করে এমন একটী পরিচ্ছন্ন ঘরে 18° থেকে 25° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখা হয়। প্রায় দশ দিন পর ডিম ফুটে রেশমকীট বের হয়। রেশম-কীটকে চলতি কথায় পলু বলে। পলু দিনে পাঁচ বার প্রচুর পরিমাণে কুচিকুচি-করা তুঁতপাতা খেতে থাকে।



50 নং চিত্র— রেশম মথের জীবন-বৃত্তান্তের বিভিন্ন দশা : ক. ডিম ; খ. পরিণত রেশম-কীট ; গ. সম্পূর্ণ গুটি ; ঘ. গুটির দীর্ঘচ্ছেদ মধ্যে পুত্তলি) ; ঙ. মথ বের হওয়ার পর গুটির অবস্থা ; চ. পুরুষ-মথ ; ছ. স্ত্রী-মথ।

তিন থেকে পাঁচ সপ্তাহ এইরকম খাওয়া চলে। পরিণত পলু দেখতে 75 মিলিমিটার লম্বা শুঁয়াপোকার মতো ; তবে, এদের গায়ে শুঁয়া থাকে না। তিন জোড়া পদ, চার জোড়া উপপদ এবং ক্লাস্‌পার (Clasper) নামে আর একজোড়া উপপদের সাহায্যে এরা চলাফেরা করে।

পলু ক্রমে খাওয়া বন্ধ করে ; তখন এদের রেশম-গ্রন্থি থেকে সুতা বের হতে থাকে। মিনিটে প্রায় 65 বার মাথা ঘুরিয়ে, এই সুতা দিয়ে পলু নিজের দেহের চারপাশে একটি আবরণ তৈরি করে। এই আবরণকে গুটি বলে। গুটি দেখতে পায়রার ডিমের মতো। গুটির মধ্যে শূক চুপচাপ পড়ে থাকে। এই অবস্থাকে **পুত্তলি** বলে। গুটি প্রস্তুত হওয়ার 8 থেকে 10 দিন পরে, কয়েকটি গুটি ছাড়া অবশিষ্ট গুটিগুলিকে গরম জলে ফেলে অথবা রোদে শুকিয়ে, পুত্তলি-গুলিকে মেরে ফেলা হয়। জীবিত গুটিগুলিকে বংশবৃদ্ধির জন্য রাখা হয়। এর থেকে শেষে পূর্ণাঙ্গ রেশম মথ সৃষ্টি হয়। এরা গুটির এক প্রান্ত কেটে বের হয়ে আসে। মৃত গুটির বাইরের দিকের অবিন্যস্ত সুতাগুলিকে প্রথমে বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে ফেলা হয় এবং চার-পাঁচটি গুটির ভিতরদিকের সুতা একসঙ্গে পাকিয়ে **রিল্‌ড সিল্‌ক (Reeled silk)** তৈরি করা হয়। এই রিল্‌ড-সিল্‌ক শোধন করে কাপড় তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় সুতা পাওয়া যায়। 28 গ্রাম ডিম থেকে 4 5 গ্রাম রিল্‌ড সিল্‌ক পাওয়া যায়। ঝেড়ে-ফেলা টুকরা-গুলিকে পাকিয়ে **স্পান সিল্‌ক (Spun silk)** তৈরি করা হয়।

মাছ ঃ মাছ অন্যতম আমিষ-জাতীয় খাদ্য। ভারতে নদী, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদির সংখ্যা খুব বেশি। এছাড়া, তিনদিকে সমুদ্র থাকায়, ভারতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

বসতি অনুসারে, মাছ সাধারণতঃ চার রকমের। কড (Cod), হাঙর, ম্যাকারেল (Mackerel) প্রভৃতি মাছ সামুদ্রিক। লোনা জল ছাড়া এরা বাঁচে না। ইলিশ, ভেট্‌কি, তপ্‌সে, পারসে, ভাঙন ইত্যাদি মাছ নদীর মোহনার অল্প লোনা জলে থাকে। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস প্রভৃতি পোনা নদীর স্রোতযুক্ত মিঠাজলে বাস করে। পুকুরের বদ্ধ জলে এরা ডিম পাড়ে না, যদিও পুকুরে এদের চাষ করা হয় ; তে-চোখো, খলসে, পুঁটি, ল্যাঠা, শাল, শোল প্রভৃতি মাছ পুকুরের বদ্ধ জলে বাস করে।

বাহ্য গঠনে সামান্য পার্থক্য থাকলেও, সব মাছের গঠন প্রায়

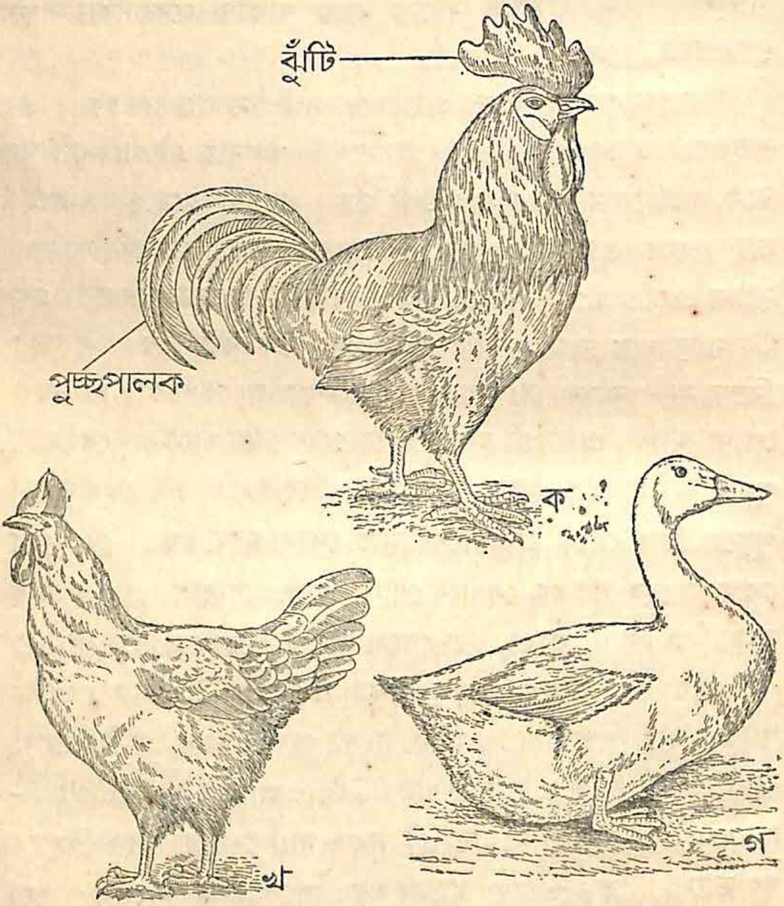
একই রকম। বেশির ভাগ মাছের গায়ে আঁশ থাকে ; তবে শিঙি, মাগুর, বোয়াল প্রভৃতি মাছের আঁশ থাকে না। কতকগুলি মাছের ফুলকা ছাড়াও, **অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র** থাকায়, এরা জলের বাইরেও বেঁচে থাকে। এদের **জিওল মাছ** বলে। শিঙি, মাগুর, কৈ, শাল, শোল, ল্যাঠা, কুঁচে প্রভৃতি জিওল মাছ। শিঙি, মাগুর, বোয়াল, পাব্‌দা, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছের গুম্ফ থাকায়, এদের ক্যাট-ফিশ (Cat-fish) বলে।

ভারতে বৎসরে গড়ে প্রায় দশ লক্ষ টন মাছ ধরা হয়। এর শতকরা ষাট ভাগ সামুদ্রিক। জনসংখ্যার তুলনায় এই পরিমাণ অল্প বলে, বর্তমানে মাছের চাষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাছের চাষ বলতে প্রধানতঃ পুকুরে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের চাষ বোঝায়। মাছ-চাষের জন্য পরিষ্কার এবং উঁচু পাড় দিয়ে ঘেরা, মাঝারি গভীর পুকুর ঠিক করা হয়। পুকুরের নিচের মাটি নরম কাদা অথবা পলিমাটি-যুক্ত হওয়া দরকার। সমস্ত পোনা মাছই প্রধানতঃ জলজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে। সেইজন্য, পুকুরে পরিমাণমতো জলজ উদ্ভিদ থাকা প্রয়োজন। এই-রকম আদর্শ পুকুরে তিন থেকে চার মাসের বাচ্চা পোনা ছাড়া হয়। যে পুকুরে পোনা মাছের চাষ হয়, সেখানে শোল, শাল, বোয়াল প্রভৃতি মাছ ছাড়া ঠিক নয়। কারণ, এরা পোনা মাছের বাচ্চা খেয়ে ফেলে।

প্রায় সব মাছেই গড়ে শতকরা 18 থেকে 25 ভাগ প্রোটীন থাকে। মাছ সহজপাচ্য। শিঙি, মাগুর প্রভৃতি মাছে প্রোটীন ছাড়া, যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ, ক্যাল্‌শিয়াম (Calcium) ও ফস্‌ফরাস (Phosphorus)-ঘটিত লবণ থাকায়, এই সমস্ত মাছ রোগীর পথ্য হিসাবে খুব ভালো। কড ও হাঙর মাছের যকৃৎ থেকে একরকম তেল পাওয়া যায়। এই তেল মূল্যবান ঔষধ। রুই ইত্যাদি মাছের আঁশের সাদা পদার্থ দিয়ে কাচ-নির্মিত কৃত্রিম মুক্তা তৈরি করা হয়। কৈ, খলিসা, তে-চোখো ইত্যাদি মাছ মশার শূক খেয়ে, মশা-দমনে সাহায্য করে। মাছের দেহাবশেষ থেকে সার তৈরী হয়।

পোল্‌ট্রি (Poultry) ঃ যে সব গৃহপালিত পাখির মাংস ও ডিম আমরা খাই, তাদের একসঙ্গে **পোল্‌ট্রি** বলা হয়। হাঁস ও মুরগি উল্লেখযোগ্য পোল্‌ট্রি।

মুরগি ও হাঁসের বাহ্য গঠন মোটামুটি পায়রার মতো। পরিণত দেশী মুরগি লম্বায় 30 থেকে 40 সেন্টিমিটার। মোরগ মুরগি থেকে



51 নং চিত্র— পোলট্রি ঃ ক. মোরগ ; খ. মুরগি ; গ. হাঁস।

বড়। এদের মাথায় লাল রঙের মাংসল ঝুঁটি থাকে। মোরগের ঝুঁটি মুরগির থেকে বড় এবং খাড়া। এদের চঞ্চু পায়রার মতো সরু, কিন্তু শক্তিশালী। চঞ্চুর শেষপ্রান্তে, গলার কাছাকাছি, দুপাশে দুটি ঝুঁটির

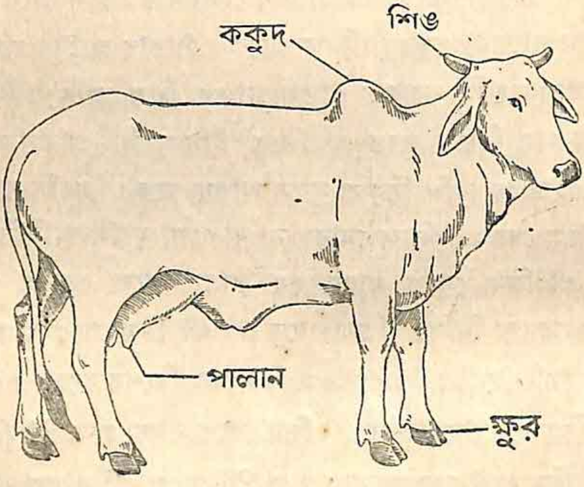
মতো লাল রঙের মাংসল অংশ ঝুলে থাকে। মোরগের পুচ্ছ-পালক খুব বড় এবং বেঁকে ঝুলে থাকে। মুরগির পুচ্ছ-পালক ছোট। বড় ঝুঁটি ও পুচ্ছ-পালক দেখে মোরগ ও মুরগি চেনা যায়। এছাড়া, মোরগের কর্কশ ডাকে তাকে চেনা যায়।

হাঁসেদের ঝুঁটি কিংবা গলায় মাংসল অংশ থাকে না। এদের চঞ্চুও সরু নয়— চ্যাপ্টা ও প্রসারিত এবং সামনের দিক ভোঁতা। হাঁসের গ্রীবা সরু। এদের পালক সাদা, ধূসর অথবা ছাই রঙের। গলার স্বর শুনে পুরুষ- অথবা স্ত্রী-হাঁস চেনা যায়। হাঁস প্রায় সারাদিন জলে এবং রাত্রে গৃহস্থের বাড়িতে থাকে। সাঁতার কাটার জন্য হাঁসের পায়ের আঙুলগুলি পরস্পর পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া।

আজকাল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করা হয়। এইভাবে বেশি ডিম ও মাংস পাওয়া যায়। মুরগি সাধারণতঃ দুরকম ডিম দেয়। পালে মোরগ না থাকলে, মুরগি **অনিষিক্ত ডিম** দেয়। এই ডিম থেকে বাচ্চা হয় না। পালে মোরগ থাকলে, মুরগি সাধারণতঃ **নিষিক্ত ডিম** পাড়ে। এই ডিম থেকে বাচ্চা হয়। বর্তমানে ইন্‌কিউবেটর (Incubator) নামক বিশেষ যন্ত্রে এককালীন 2000 ডিম ফোটানো যায়। ডিম থেকে বাচ্চা হতে 21 দিন সময় লাগে। ডিম ফুটে বের হওয়ার প্রায় 20 থেকে 25 সপ্তাহ পর মুরগি ডিম দেয়। এক বৎসর বয়সের মুরগি বেশি ডিম দেয়। দ্বিতীয় বৎসর থেকে ডিমের সংখ্যা কমতে থাকে। সচরাচর এই বয়সের মুরগি এবং মোরগের মাংস খাওয়া হয়। ভারতে দেশী মুরগি ছাড়া, লেগ হর্‌ন(**Leg Horn**), রোড আইল্যান্ড (**Rhode Island**), প্লিমাউথ রক (**Plymonth Rock**) প্রভৃতি বিদেশী জাতের মুরগিও চাষ করা হয়।

ইন্‌কিউবেটরে হাঁসের ডিমও ফোটানো যায়। হাঁসের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে 28 দিন লাগে। **খাঁকি ক্যাম্বেল (Khanki Cambell)** জাতের হাঁস সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়। হাঁসের চেয়ে মুরগির মাংস বেশি পুষ্টিকর। তবে, হাঁস ও মুরগির ডিম প্রায় সমান পুষ্টিকর।

গরু ঃ গরু অন্যতম গৃহপালিত প্রাণী। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী। পুরুষ-গরুকে ষাঁড় বলে। উপস্থচ্ছেদ করা ষাঁড়কে **বলদ** বলা হয়। পরিণত দেশী গরু প্রায় এক মিটার উঁচু এবং মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সওয়া এক মিটার লম্বা। গরুর মাথার উপরের দিকে দুটি শিঙ এবং দুপাশে দুটি লম্বাটে **কর্ণছত্র** থাকে। গলার নিচের দিকে কিছুটা চামড়া ঝুলে থাকে। একে **গলকম্বল** বলে। পিঠের দিকে, ধড়ের প্রথম অংশে একটি উঁচু মাংসল অংশ থাকে। একে **ককুদ** বলে।



52 নং চিত্র— গরু।

ষাঁড়ের ককুদ বেশি উঁচু। গরুর পায়ের শেষ অংশে দ্বিখণ্ডিত **ক্ষুর** দেখা যায়। দেহের শেষ-প্রান্তে লম্বা ও সরু লেজ থাকে। লেজের ডগায় ঘন কালো চুল দেখা যায়। গরুর পেটের দিকে, দুটি পশ্চাৎ-পদের মাঝে **স্তন্যগ্রন্থি** থাকে। চলতি কথায় একে **পালান** বলে। স্তন্যগ্রন্থিতে মোট চারটি **স্তনবৃন্ত** বা বাঁট দেখা যায়।

সাধারণতঃ দুই থেকে আড়াই বৎসর বয়সী গরু প্রথম গর্ভবতী হয়। প্রসবের প্রথম সপ্তাহে যে দুধ পাওয়া যায়, তাকে গাঁজলা দুধ বলে। এক সপ্তাহ পরে দুধ স্বাভাবিক হয়।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গো-পালনকে ডেয়ারি ফার্মিং (Dairy

farming) বলে। এইভাবে গো-পালনে বেশি দুধ পাওয়া যায়। সবরকমের খইল, দানাশস্য, বিচালি ও খড়, ধানের কুঁড়া, গমের ভুষি ও চুনি গরুর খাদ্য। দুগ্ধবতী গাভীকে খইল, ডালচুনি, ধানের কুঁড়া, গমের ভুষি দিয়ে তৈরী সার খাদ্য বা পোস্টাই খেতে দেওয়া হয়।

দুধে শতকরা 85 থেকে 87 ভাগ জল, 3 থেকে 4 ভাগ স্নেহদ্রব্য, 3 থেকে 3·5 ভাগ প্রোটীন, 4 থেকে 5 ভাগ দুগ্ধশর্করা, 0·7 থেকে 0·75 ভাগ নানাধরনের লবণ, এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় ভাইটামিন (Vitamins) থাকায়, দুধ স্বয়ং-সম্পূর্ণ খাদ্য। শিশুদের বৃদ্ধির জন্য দুধ অত্যাবশ্যক। দুধ থেকে ননী, মাখন, পনির, ঘি, দই, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি তৈরী হয়। গরুর ক্ষুর ও শিঙ দিয়ে চিরুনি, বোতাম, শিরিষ আঠা প্রভৃতি তৈরী হয়। গো-মাংস, খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গরুর চামড়া দিয়ে জুতা ইত্যাদি তৈরী হয়। ষাঁড় ও বলদ গাড়ি টানার কাজে এবং চাষ-আবাদের কাজে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

1. যে-কোনও একটি খাদ্যশস্য সম্বন্ধে যা জান, লেখ।

2. সুতা ও জামা-কাপড়ের জন্য কোন উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়?

3. দুটি প্রধান তৈল-উৎপাদী উদ্ভিদের নাম লেখ। একটি একবীজপত্রী তৈল-উৎপাদী উদ্ভিদ বর্ণনা কর।

4. যে কোনও একটি কাষ্ঠ-উৎপাদী উদ্ভিদ সম্বন্ধে যা জান লেখ?

5. নিচে আমাদের ব্যবহৃত কতকগুলি বস্তুর নাম দেওয়া হল। ঐগুলি কোন উদ্ভিদের অংশ থেকে তৈরি হয়, লেখ:—

(ক) ধুনা; (খ) খড়; (গ) আঠা; (ঘ) দড়ি; (ঙ) আসবাব-পত্র; (চ) রান্নার তেল।

6. রেশম মথ সম্বন্ধে যা জান, লেখ।

7. ভারতে মাছের চাষ কিভাবে করা হয়, লেখ।

8. পোলট্রি কি? মুরগির বাহ্য গঠন লেখ। ভারতে মুরগি-পালন সম্বন্ধে যা জান, লেখ।

9. গরুর দেহ-গঠন বর্ণনা কর।

10. দুধকে স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য হিসাবে ধরা হয় হয় কেন ?

11. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে **হ্যাঁ**, এবং যেটি ভুল, তার পাশে **না** লেখ :—

(ক) সমস্ত খাদ্যশস্য থেকে তৈল পাওয়া যায়। (খ) পাট থেকে দড়ি ও বস্তা তৈরী হয়। (গ) নারিকেল-গাছের মূল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (ঘ) কার্পাস-গাছের কাণ্ড থেকে তুলা পাওয়া যায়। (ঙ) সরিষার খইল গবাদি পশুর খাদ্য। (চ) রেশম মথের ডিম থেকে রেশম পাওয়া যায়। (ছ) রুই একটি সামুদ্রিক মাছ। (জ) বাইরে থেকে দেখে মুরগি ও মোরগ চেনা যায়। (ঝ) শিশুদের বৃদ্ধির জন্য দুধ অত্যাবশ্যক।

12. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) পাট থেকে — ও — তৈরী হয়। (খ) অপরিণত নারিকেলকে — বলে। (গ) সমস্ত ডা'ল — উদ্ভিদ। (ঘ) সমস্ত ডা'লগাছের পুষ্প দেখতে — মতো। (ঙ) কার্পাস-গাছের — থেকে — পাওয়া যায়। (চ) শাল-গাছের — থেকে — পাওয়া যায়। (ছ) রেশম মথের — থেকে রেশম তৈরি হয়। (জ) পোনা মাছেরা — জলে — করে না। (ঝ) — ও— জিওল মাছ। (ঞ) হাঁসের চেয়ে —র মাংস বেশি পুষ্টিকর।

খাদ্য | 5

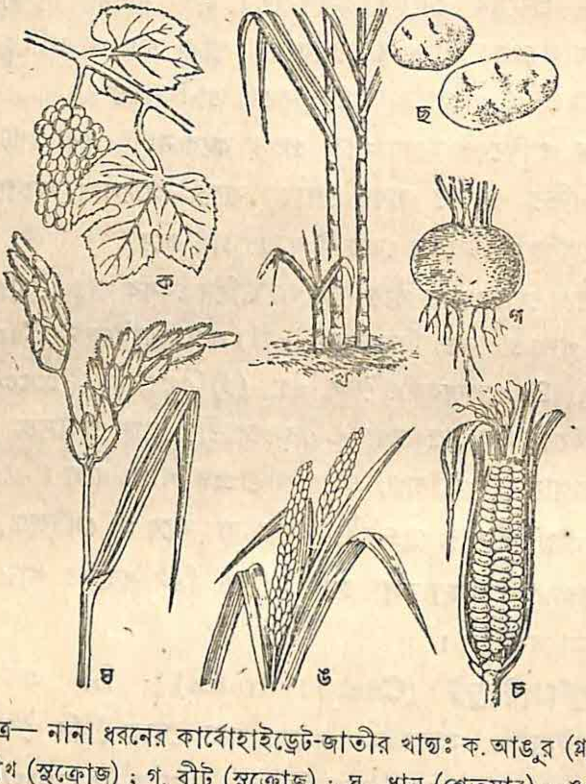
সমস্ত জীবের দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য খাদ্যের দরকার হয়। আবার, খাদ্য থেকে শক্তি পাওয়া যায়। শক্তি এবং স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী যা গ্রহণ করে, তা-ই খাদ্য।

উদ্ভিদ, প্রাণীদের মতো খাদ্য গ্রহণ করে না। এরা মাটি থেকে জল ও বিভিন্ন ধরনের লবণ শোষণ করে, আলোর সাহায্যে এক বিশেষ পদ্ধতিতে, নিজের দেহে-ই খাদ্য তৈরি করে।

প্রাণীরা যেসব খাদ্য খায় কিংবা উদ্ভিদ যেসব খাদ্য তৈরি করে, সেই সব খাদ্য প্রধানতঃ তিন রকম—(1) কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates), (2) স্নেহদ্রব্য ও তৈল এবং (3) প্রোটীন (Proteins)। কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহদ্রব্য ও তৈল-জাতীয় খাদ্য প্রধানতঃ জীবের শক্তি যোগায়। সেইজন্য, এদের **শক্তিপ্রদ খাদ্য** বলে। প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য জীবের দেহ-গঠনে সাহায্য করে। সেইজন্য, এদের **দেহ-গঠনকারী খাদ্য** বলা হয়। নিচে তিন ধরনের খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates) : চিনি এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট। সচরাচর আখের রস থেকে চিনি তৈরী হয়। সেইজন্য, চিনির অন্য নাম **ইক্ষুশর্করা** বা **সুক্রোজ** (Sucrose)। অবশ্য, বীটের মূল থেকেও সুক্রোজ পাওয়া যায়। পাকা আঙুর, কুল, আপেল ও পিঁয়াজের রসালো শল্কপত্রে আর এক ধরনের মিষ্ট কার্বোহাইড্রেট থাকে। এর নাম **দ্রাক্ষাশর্করা** বা **গ্লুকোজ** (Glucose)। দুধে **দুগ্ধশর্করা** বা **ল্যাক্‌টোজ** (Lactose) এবং নানারকম পাকা মিষ্ট ফলে **ফলশর্করা** বা **ফ্রাক্‌টোজ** (Fructose) থাকে। সুক্রোজ, গ্লুকোজ, ফ্রাক্‌টোজ ও ল্যাক্‌টোজ স্বাদে কম-বেশি মিষ্ট। সেইজন্য, এই ধরনের কার্বোহাইড্রেট **শর্করা** নামে পরিচিত।

ভাত, রুটি, চিঁড়া, মুড়ি, বিস্কুট, গোল-আলু, রাঙা-আলু প্রভৃতি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে **শ্বেতসার** বা **স্টার্চ (Starch)** নামে এক-ধরনের কার্বোহাইড্রেট থাকে। শ্বেতসার শর্করার মতো মিষ্ট নয়। আমাদের খাদ্যের বেশির ভাগ অংশই শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য। চাউলে



53 নং চিত্র— নানা ধরনের কার্বোহাইড্রেট-জাতীর খাদ্যঃ ক. আঙুর (গ্লুকোজ); খ. আখ (সুক্রোজ) ; গ. বীট (সুক্রোজ) ; ঘ. ধান (শ্বেতসার) ; ঙ. গম (শ্বেতসার) ; চ. ভুট্টা (শ্বেতসার) ; ছ. গোল-আলু (শ্বেতসার)।

শতকরা 70 থেকে 80 ভাগ, গমে শতকরা প্রায় 70 ভাগ, ভুট্টায় শতকরা প্রায় 88 ভাগ এবং গোল-আলুতে শতকরা প্রায় 20 ভাগ শ্বেতসার আছে।

শ্বেতসার প্রাণীদের প্রধান খাদ্য হলেও, প্রাণিদেহে শ্বেতসার সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে থাকে না। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যকৃৎ ও পেশীতে শ্বেতসারের মতো আর এক ধরনের সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট থাকে।

এই ধরনের কার্বোহাইড্রেটকে বলে প্রাণী শ্বেতসার বা গ্লাইকোজেন (Glycogen)। উদ্ভিদের মধ্যে কেবল ছত্রাকের দেহে শ্বেতসারের বদলে গ্লাইকোজেন সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে থাকে।

সেলুলোজ (Cellulose) আর এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট। আমরা খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ গ্রহণ করি। শাকাশী প্রাণীদের খাদ্যে প্রচুর সেলুলোজ থাকে। কিন্তু গরু, মহিষ, উট প্রভৃতি প্রাণী ছাড়া, অন্য প্রাণীরা সেলুলোজ হজম করতে পারে না; মলের সঙ্গে সেলুলোজ দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। সেইজন্য, এই সমস্ত প্রাণী ছাড়া, অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেলুলোজ খাদ্য নয়। কিন্তু, সেলুলোজ উদ্ভিদের দেহ-গঠনের কাজে লাগে। সেইজন্য, কার্বোহাইড্রেট হলেও, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেলুলোজ দেহ-গঠনকারী খাদ্য। সব কার্বোহাইড্রেট-ই কার্বন (Carbon), অক্সিজেন (Oxygen) ও হাইড্রোজেন (Hydrogen)— এই তিনটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরী। এই মৌলিক পদার্থগুলি বিভিন্ন অনুপাত থেকে, বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট গঠন করে।

স্নেহদ্রব্য ও তৈল: ঘি, মাখন, চর্বি, বনস্পতি-ঘি প্রভৃতি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত খাদ্য স্নেহদ্রব্যের উদাহরণ। সাধারণ



54 নং চিত্র— স্নেহদ্রব্য ও তৈল-জাতীয় খাদ্য: ক. ঘি; খ. মাখন; গ. সরিষার তেল; ঘ. বনস্পতি-ঘি।

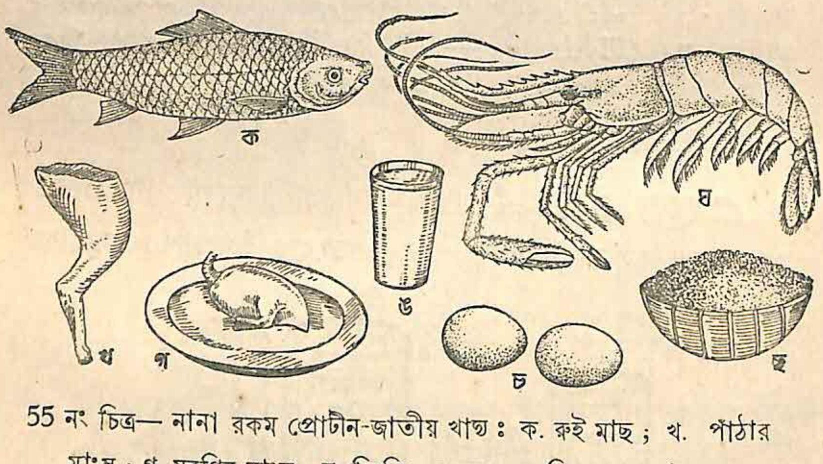
উষ্ণতায় স্নেহদ্রব্য কঠিন কিংবা অর্ধ-তরল। সরিষা, নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি রান্নার তেল তৈল-জাতীয় খাদ্য। এই জাতীয় খাদ্য স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল পদার্থ।

উদ্ভিদের খাদ্য-সঞ্চয়কারী অঙ্গ, বিশেষতঃ তৈল-প্রধান বীজের বীজপত্রে ও সস্যে প্রচুর তৈল থাকে। রেড়ি ও নারিকেলের সস্যে, সরিষা, বাদাম, তিল ইত্যাদির বীজপত্রে বেশি পরিমাণে তৈল থাকে।

মানুষের বৃক্কের চারপাশে এবং চর্মের নিচে, বিশেষ করে পেটের চর্মের নিচে, প্রচুর চর্বি জমা থাকে। ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর পেটেও প্রচুর চর্বি থাকে। তিমির চর্মের নিচের চর্বির স্তর খুব পুরু।

কার্বোহাইড্রেটের মতো, স্নেহদ্রব্য ও তৈল-ও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে গঠিত ; তবে, এক্ষেত্রে অক্সিজেনের অনুপাত কম।

প্রোটীন (Proteins) ঃ বিভিন্ন ধরনের মাছ, মাংস, চিংড়ি, ডিম প্রভৃতি আমিষ-জাতীয় খাদ্য এবং দুধ ও সবরকম ডা'লে প্রচুর প্রোটীন থাকে।



55 নং চিত্র— নানা রকম প্রোটীন-জাতীয় খাদ্য ঃ ক. রুই মাছ ; খ. পাঁঠার মাংস ; গ. মুরগির মাংস ; ঘ. চিংড়ি ; ঙ. দুধ ; চ. ডিম ; ছ. ডা'ল।

শ্বেতসার-প্রধান বীজে প্রোটীনের পরিমাণ কম ; যেমন— চাউলে মাত্র 7% ও গমে 12% প্রোটীন থাকে। অবশ্য, তৈল-প্রধান বীজে বেশি প্রোটীন আছে ; সূর্যমুখীর বীজে 30% প্রোটীন থাকে। উদ্ভিদ-জাত খাদ্যের মধ্যে ডা'লে সবচেয়ে বেশি প্রোটীন থাকে ; সয়াবীন (Soy-bean)-এ 42% থেকে 47% এবং অন্যান্য ডা'লে গড়ে প্রায় 25% প্রোটীন আছে।

মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। মাছ ও মাংসে গড়ে 15% থেকে 20% প্রোটীন থাকে। সমস্ত প্রোটীন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন (Nitrogen) দিয়ে গঠিত। এছাড়া, কতকগুলি প্রোটীনে সাল্‌ফার (Sulphur) ও ফস্‌ফরাস থাকে। কতকগুলি পরিচিত খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটীন এবং স্নেহদ্রব্য ও তৈলের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল ঃ

খাদ্যের নাম	কার্বোহাইড্রেট (শতকরা ভাগ)	প্রোটীন (শতকরা ভাগ)	স্নেহদ্রব্য ও তৈল (শতকরা ভাগ)
রুটি	50	8	2
বিস্কুট	70	8	10
মাখন	0	2	85
দুধ	7	5	6
ডিম	0	12	11
গোল-আলু	22	3	0
রুই মাছ	0	17	1
পাঁঠার মাংস	0	18	10
লেবু	9	1	1

উপরে তিন ধরনের খাদ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে, তাছাড়া **ভাইটামিন** (Vitamins) নামে আরও এক শ্রেণীর খাদ্য জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য দরকার হয়। এরা জীবকে রোগের আক্রমণ থেকেও রক্ষা করে। সেইজন্য, ভাইটামিনকে **রক্ষী খাদ্য** বলা হয়। ভাইটামিন খুব কম পরিমাণে লাগে। শাক-সব্‌জি, দুধ, ডিম ও ফলে নানাধরনের ভাইটামিন থাকে।

জীবের বৃদ্ধির জন্য **খনিজ লবণ**-ও প্রয়োজন। উদ্ভিদ মাটি থেকে লবণ গ্রহণ করে। কার্বোহাইড্রেট, স্নেহদ্রব্য ও তৈল, প্রোটীন, ভাইটামিন এবং বিভিন্ন ধরনের লবণ যে খাদ্যে পরিমাণমতো থাকে, তাকে **সুষম খাদ্য** বলে। দুধ একটি সুষম খাদ্য। সেইজন্য, শিশুদের বৃদ্ধির জন্য দুধ অপরিহার্য।

অনুশীলনী

1. শক্তিপ্রদ খাদ্য কি কি? কোন খাদ্যে শ্বেতসার বেশি?

2. চারিটি স্নেহদ্রব্য ও তৈল-জাতীয় খাদ্যের নাম লেখ। কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহদ্রব্য-জাতীয় খাদ্যের প্রধান পার্থক্য কি?

4. সুষম খাদ্য কাকে বলে? সুষম খাদ্যের মধ্যে রক্ষী খাদ্য কোনগুলি?

5. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে **হ্যাঁ** এবং যেটি ভুল, তার পাশে **না** লেখ :—

(ক) গোল-আলু তৈল-প্রধান খাদ্য। (খ) প্রাণিদেহে সঞ্চিত শ্বেতসারকে গ্লাইকোজেন বলে। (গ) আমিষ-জাতীয় খাদ্যে বেশি শর্করা থাকে। (ঘ) শ্বেতসারকে প্রাণীর দেহ-গঠনকারী খাদ্য বলে। (ঙ) ভাইটামিন এক ধরনের রক্ষী খাদ্য। (চ) সুষম খাদ্যে বেশি শর্করা থাকে।

6. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) কার্বোহাইড্রেট হলেও, — উদ্ভিদের দেহ-গঠনে লাগে। (খ) স্নেহদ্রব্য সাধারণ উষ্ণতায় — এবং তৈল-জাতীয় খাদ্য সাধারণ উষ্ণতায় — পদার্থ। (গ) দুধ ও ডিমে বেশি পরিমাণে — থাকে। (ঘ) — এক ধরনের রক্ষী খাদ্য। (ঙ) — একটি সুষম খাদ্য।

ভেষজ উদ্ভিদ ও ক্ষতিকর প্রাণী

6

কয়েক ধরনের উদ্ভিদ থেকে কয়েক রকম মূল্যবান ঔষধ পাওয়া যায়। যেসব উদ্ভিদ থেকে ঔষধ প্রস্তুত করা যায়, তাদের **ভেষজ** উদ্ভিদ বলে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে রেশম মথ, গরু প্রভৃতি কয়েকটি অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর কথা বলা হয়েছে। মানুষের উপকারে লাগে বলে, এইসব প্রাণীদের **উপকারী প্রাণী** বলা হয়।

কিন্তু ইঁদুর, মশা, মাছি প্রভৃতি প্রাণী মানুষের উপকার তো করেই না, উপরন্তু নানাভাবে ক্ষতি করে। সেইজন্য, এইসব প্রাণীকে **ক্ষতিকর প্রাণী** বলা হয়। এই পরিচ্ছেদে কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদ ও ক্ষতিকর প্রাণীর বিষয়ে বলা হল।

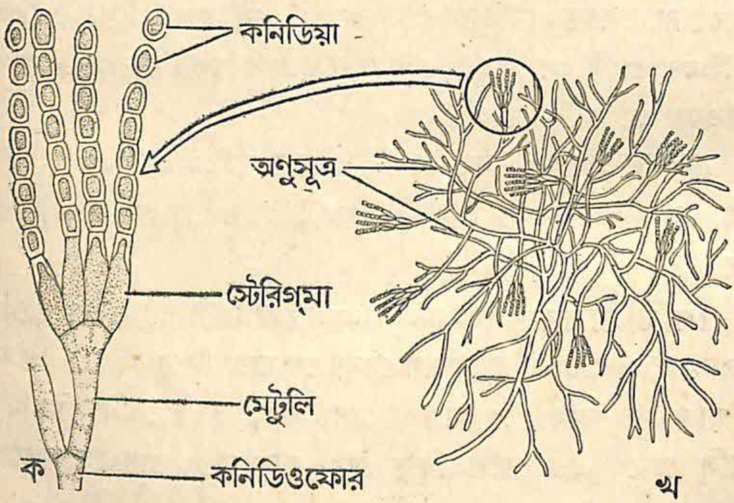
ভেষজ উদ্ভিদ ঃ নিচে পেনিসিলিয়াম (*Penicillium*), সর্পগন্ধা ও ধুতুরা— এই তিনটি ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

পেনিসিলিয়াম (*Penicillium*) ঃ পেনিসিলিয়াম এক ধরনের ছত্রাক। সাধারণতঃ বর্ষাকালে লেবুর খোসার উপর নীলচে গুঁড়া গুঁড়া দানার মতো যে আস্তরণ দেখা যায়, তা-ই পেনিসিলিয়াম। খালি চোখে এর বেশি কিছু দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর গঠন বোঝা যায়।

পেনিসিলিয়ামের দেহ খুব সরু সুতার মতো অণুসূত্র নিয়ে গঠিত। অনেক অণুসূত্র একসঙ্গে ঘেঁযাঘেঁষি হয়ে, ফলের খোসার উপর থাকে। প্রতিটি অণুসূত্র এক সারি আয়তাকার কোষ নিয়ে গঠিত। কতকগুলি অণুসূত্র খাড়া হয়ে বাড়ে। এই অণুসূত্রের মাথায় জননকোষ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অণুসূত্রের ডগায় তিনটি কিংবা চারটি শাখা সৃষ্টি হয়। এই শাখাগুলিকে বলে **কনিডিওফোর** (**Conidiophore**)। প্রতিটি কনিডিওফোর থেকে একইভাবে প্রশাখা বের

হয়। প্রশাখাগুলিকে **মেটুলি** (**Metulae**) বলে। মেটুলি থেকে আবার শাখা বের হয়। এইগুলির নাম **স্টেরিগ্‌মা** (**Sterigma**)। স্টেরিগ্‌মা দেখতে সূক্ষ্ম বোতলের মতো। স্টেরিগ্‌মার মাথায় সারিবদ্ধ গোল জনন-কোষ উৎপন্ন হয়। এগুলিকে বলে **কনিডিয়া** (**Conidia**)। কনিডিয়া এক ধরনের অযৌন কোষ। কনিডিয়া থেকে নূতন পেনিসিলিয়ামের অণুসূত্র জন্মায়।

1929 খ্রীষ্টাব্দে **স্যার আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং** (**Sir Alexander Fleming**) লক্ষ্য করেন যে, পেনিসিলিয়াম অণুসূত্রের সংস্পর্শে এলে, **স্ট্যাফাইলোকক্কাস** (*Staphylococcus*) নামক এক ধরনের রোগ-জনক জীবাণু* বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। পরে পরীক্ষা করে ফ্লেমিং



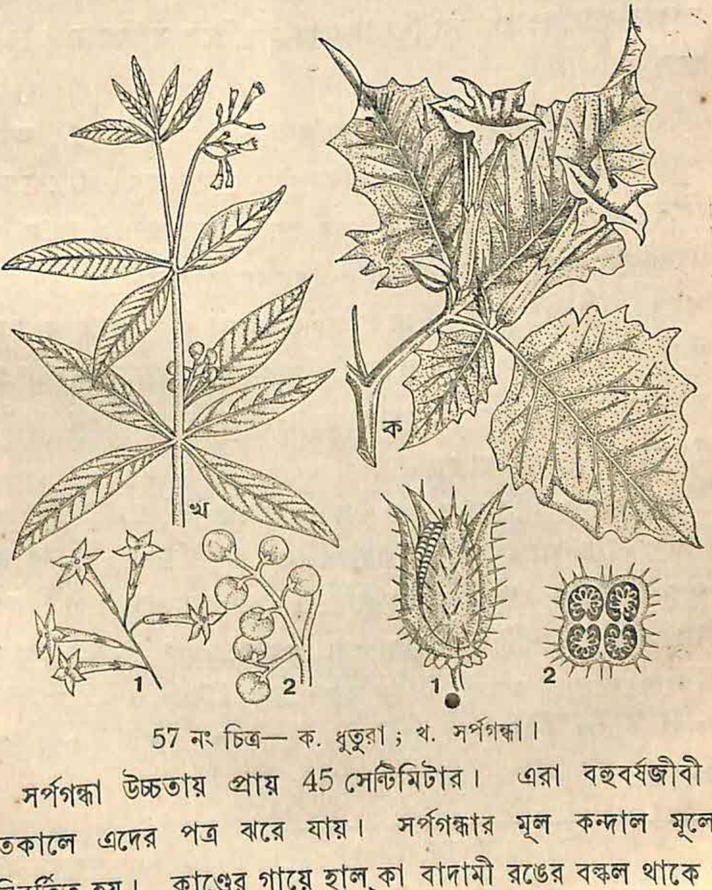
56 নং চিত্র— পেনিসিলিয়ামের গঠন (অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যেমন দেখা যায়)।

দেখেন, পেনিসিলিয়ামের অণুসূত্র থেকে এক ধরনের পদার্থ ক্ষরিত হয়। এর ফলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ফ্লেমিং এর নাম দেন **পেনিসিলিন** (**Penicillin**)। স্ট্যাফাইলোকক্কাস ছাড়া, নিউমোনিয়া (Pneumonia), ডিপ্‌থেরিয়া (Diphtheria) প্রভৃতি রোগের

* যেসব জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে, তাদের **রোগজনক জীবাণু** (**Pathogenic bacteria**) বলা হয়।

জীবাণুও পেনিসিলিনের সাহায্যে ধ্বংস করা সম্ভব। পেনিসিলিন মূল্যবান জীবাণু-নাশক। বর্তমানে, অবশ্য, পেনিসিলিন, পেনিসিলিয়াম থেকে তৈরি করা হয় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পেনিসিলিন তৈরি করা হয়।

***সর্পগন্ধা* ঃ** সর্পগন্ধা এক ধরনের দ্বিবীজপত্রী, গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ। হিমালয়ের পাদদেশে এবং গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে, সাধারণতঃ শাল, বট, বয়ড়া, শিমুল প্রভৃতি গাছের ছায়ায় এবং বাঁশবনে সর্পগন্ধা জন্মায়।



57 নং চিত্র— ক. ধুতুরা ; খ. সর্পগন্ধা।

সর্পগন্ধা উচ্চতায় প্রায় 45 সেন্টিমিটার। এরা বহুবর্ষজীবী। শীতকালে এদের পত্র ঝরে যায়। সর্পগন্ধার মূল কন্দাল মূলে পরিবর্তিত হয়। কাণ্ডের গায়ে হাল্‌কা বাদামী রঙের বল্কল থাকে। সাধারণতঃ কাণ্ডের পর্ব থেকে পত্রগুলি আবর্তাকারে জন্মায়।

পত্র প্রায় সাত সেন্টিমিটার লম্বা এবং ভল্লাকার। পত্রের উপরের তল গাঢ় সবুজ, নিচের তল হাল্কা সবুজ। পুষ্পবিন্যাসে সাদা বা গোলাপী রঙের সরু সরু পুষ্প গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত থাকে। ফল ড্রুপজাতীয়।

ভারতে প্রাচীনকাল থেকে সর্পগন্ধার মূলের রস মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগীর ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সর্পগন্ধার মূলে রাউল্‌ফিন (**Rauwolfin**) নামে একধরনের উপক্ষার* থাকে। এই উপক্ষার প্রধানতঃ রক্ত-চাপ নিয়ন্ত্রণ করে। সেইজন্য, বর্তমানে ভারতে ব্যাপকভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সর্পগন্ধার চাষ করা হচ্ছে।

বীজ কিংবা কাণ্ডের অংশ থেকে সর্পগন্ধার বংশবৃদ্ধি হয়। কাণ্ডের অংশ ছোট ছোট করে কেটে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে কাণ্ড থেকে মূল বের হয়। সাধারণতঃ ছমাস পরে এদের পুষ্প জন্মায়। অবশ্য, বেশি উষ্ণতায় তাড়াতাড়ি পুষ্প জন্মাতে পারে। প্রথম দু-তিন বৎসর এদের কেবল বীজ সংগ্রহ করা হয়। দু-তিন বছর পরে এদের মূলে যথেষ্ট পরিমাণে উপক্ষার তৈরী হয়। তখন মূলগুলি মাটি থেকে তোলা হয়। মূল থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে উপক্ষার নিষ্কাশন করা হয়।

ধুতুরা ঃ ধুতুরা-ও এক ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ। ধুতুরা প্রায় এক মিটার লম্বা, গুল্ম-শ্রেণীর দ্বিবীজপত্র উদ্ভিদ। এদের কাণ্ড খাড়া। কাণ্ড থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয়। পত্র চওড়া, 12 থেকে 15 সেন্টিমিটার লম্বা এবং কিনারায় খাঁজ-কাটা। পুষ্প সাদা কিংবা ঘোলাটে রঙের, চোঙের মতো এবং 10 থেকে 15 সেন্টিমিটার লম্বা। ফল ক্যাপ্‌সুল-জাতীয়। ফলত্বকে ছোট ছোট কাঁটা থাকে।

---

* উপক্ষার উদ্ভিদের দেহে সৃষ্ট এক রকম পদার্থ। এই পদার্থ উদ্ভিদের কোনও প্রয়োজনে লাগে না। কতকগুলি উপক্ষার থেকে মূল্যবান ঔষধ তৈরী হয়।

ধুতুরার বীজ, পত্র ও মূলে **স্ট্র্যামোনিয়াম (Stramonium)** নামে এক ধরনের উপক্ষার সৃষ্টি হয়। এই উপক্ষার বিষাক্ত হলেও এর থেকে মূল্যবান ঔষধ তৈরী হয়। স্ট্র্যামোনিয়াম প্রধানতঃ ব্যথা-বেদনা উপশম করে। হাঁপানির ঔষধ হিসাবেও এর ব্যবহার প্রচলিত। এই উপক্ষার দিয়ে এক রকম মলম তৈরি করা হয়। এই মলম রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

ভারতে মোটামুটি দশ জাতের ধুতুরা পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'মেটেল' (*Datura metal*) জাতের ধুতুরায় সবচেয়ে বেশি স্ট্র্যামোনিয়াম পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বীজ থেকে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। ফল পরিণত হলে, গাছ গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয় এবং পাতা, ফল ও মূল আলাদা আলাদাভাবে রোদে শুকিয়ে, তার থেকে উপক্ষার নিষ্কাশন করা হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত সার বেশি দিলে, এই উপক্ষারের পরিমাণ বাড়ে।

ক্ষতিকর প্রাণী ঃ ক্ষতিকর প্রাণী প্রধানতঃ দুই ধরনের। এক ধরনের ক্ষতিকর প্রাণী মানুষের খাদ্য খেয়ে অথবা নষ্ট করে, মানুষের ক্ষতি করে। এদের উপদ্রব বলা হয়। আর এক ধরনের ক্ষতিকর প্রাণী নানারকম সংক্রামক রোগের বিস্তারে সাহায্য করে। এদের **রোগ-সৃষ্টিকারী প্রাণী** বলে।

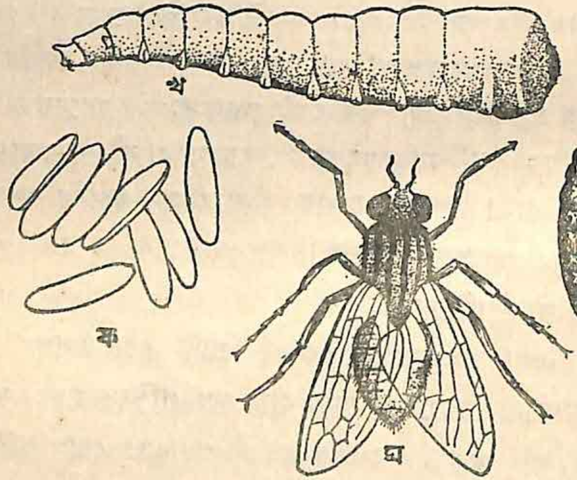
ইঁদুরকে একাধারে রোগ-সৃষ্টিকারী প্রাণী এবং উপদ্রব বলা যায়। এরা ধানের শীষ কেটে নিয়ে যায় এবং বাড়িতে অথবা গুদামে রাখা শস্যও নষ্ট করে। মশা ও মাছি প্রধানতঃ রোগ-সৃষ্টিকারী প্রাণী। তবে, মশার হুল ফোটানো-ও খুব বিরক্তিকর। নিচে এই তিন ধরনের ক্ষতিকর প্রাণীর বিষয়ে আলোচনা করা হল।

মাছি ঃ প্রজাপতি ও মথের মতো, মাছিও পতঙ্গ শ্রেণীর সন্ধি-পদ প্রাণী। এরা সাধারণতঃ নর্দমা, পায়খানা, আঁস্তাকুড় ইত্যাদি নোংরা জায়গায় বাস করে এবং দিনের বেলায় ঘর-বাড়িতে প্রবেশ করে, খোলা খাবার ইত্যাদির উপর বসে এবং খুবই উপদ্রব করে।

মাছির দেহ যথারীতি মাথা, বুক এবং পেট— এই তিনটি প্রধান

অংশে বিভক্ত। মাথায় এক জোড়া শুঙ্গ এবং এক জোড়া বড় পুঞ্জাক্ষি আছে। এদের মুখোপাঙ্গগুলি পরিবর্তিত হয়ে পচা-গলা খাদ্য খাওয়ার উপযোগী মোটা ও ভোঁতা শুঁড় সৃষ্টি করে। বুকের উপরের অংশ থেকে দুজোড়া ডানা এবং নিচের দিক থেকে তিন জোড়া পা বের হয়।

মাছির জীবনেও মথের মতো, ডিম, শূক, পুত্তলি এবং **সমঙ্গ** অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ (মাছি)— এই চারটি দশা আছে। স্ত্রী-মাছি পচা-গলা জৈব পদার্থের উপর এককালে 20টি থেকে 150টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি লম্বাটে এবং প্রায় এক মিলিমিটার লম্বা (58 নং চিত্র-ক)। মোটামুটি দুদিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূক (58 নং চিত্র-খ) বের হয়। শূক দেখতে কতকটা একদিকে সরু লম্বা নলের মতো। এদের পা নেই। মাছির শূককে **ম্যাগট (Maggot)** বলা হয়।



58 নং চিত্র— মাছির জীবনের বিভিন্ন দশা : ক. ডিম ; খ. শূক ; গ. পিউপেরিয়াম ; ঘ. সমঙ্গ মাছি।

এরা পচা-গলা জৈব পদার্থ খেয়ে এবং মোট চার বার খোলস ত্যাগ করে পুত্তলিতে পরিণত হয়। পুত্তলি একটি বাদামী রঙের আবরণের মধ্যে থাকে। এই আবরণকে **পিউপেরিয়াম (Puparium)** বলে (58 নং চিত্র-গ)। ক্রমে পুত্তলি থেকে সমঙ্গ মাছি (58 নং চিত্র-ঘ) সৃষ্টি হয় এবং পিউপেরিয়াম ভেদ করে বাইরে চলে আসে।

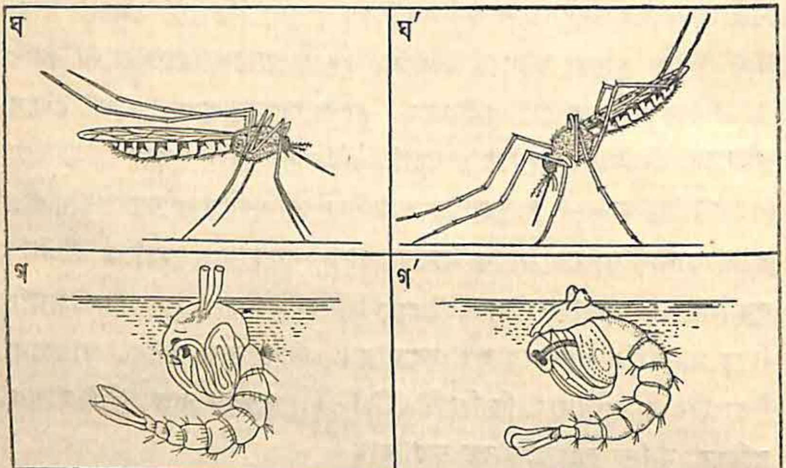
মাছির সাহায্যে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এইসব রোগগ্রস্ত রোগীর মল, কফ, থুথু ইত্যাদির উপর মাছি বসলে, মাছির পায়ে এইসব রোগের জীবাণু-যুক্ত মল, কফ, থুথু ইত্যাদি লেগে যায়। এই মাছি খাদ্যের উপরে বসলে, রোগ-জীবাণু মাছির পা থেকে খাদ্যে লেগে যায়। এইরকম রোগ-জীবাণু-যুক্ত খাদ্য খেলে, ঐ সমস্ত রোগ হতে পারে। মাছি এইভাবে রোগ ছড়ায়।

মাছি-দমন ঃ মাছির সাহায্যে রোগ-বিস্তার বন্ধ করার জন্য খাদ্য ও পানীয় সব সময় ঢেকে রাখা দরকার। মাছির উৎপাত দমন করার জন্য ফিনাইল (Phenyl), লাইজল (Lysol) ইত্যাদি দিয়ে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা দরকার। আঁস্তাকুড়, নর্দমা, পায়খানা ইত্যাদির আশেপাশে ডি.ডি.টি. (D.D.T.) অথবা অন্য কীট-নাশক ছড়িয়ে, মাছির বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা যায়।

মশা ঃ ভারতে প্রধানতঃ তিন ধরনের মশা পাওয়া যায়। যেমন— অ্যানোফিলিস (*Anopheles*), কিউলেক্স (*Culex*) এবং ঈডিস (*Aedes*)। স্ত্রী-মশা রক্ত শোষণ করে, পুরুষ-মশা গাছের রস শোষণ করে। অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু সংক্রামিত করে। কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া (Filaria) এবং ঈডিস মশা ডেঙ্গু ও পীত-জ্বরের জীবাণু সংক্রামিত করে। রোগীর রক্তে এই সমস্ত রোগের জীবাণু থাকে। মশা জীবাণু-যুক্ত রক্ত শোষণ করার পর, রোগ-বিহীন অন্য মানুষের রক্ত শোষণ করার সময়, মশার দেহের ভিতর থেকে ঐ জীবাণু-দুষ্ট রক্ত রোগ-বিহীন মানুষের দেহে চলে যায়। মশা এইভাবে রোগ-বিস্তার করে। মশার 'হুল-ফোটানো'-ও কম বিরক্তিকর নয়।

মশা-ও পতঙ্গ। এর-ও দেহ, মাথা, বুক ও পেট— এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত। এদের মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি এবং এক জোড়া রোমশ শুঙ্গ থাকে। পুরুষ-মশার শুঙ্গে বেশি রোম থাকে। মশার মুখোপাঙ্গগুলি পরিবর্তিত হয়ে সরু শুঁড় তৈরি করে।

মশার-ও যথারীতি তিন জোড়া পা এবং তুজোড়া ডানা আছে। এদের পা-গুলি খুব সরু ও লম্বা এবং পিছনের ডানা তুটি খুব ছোট। মশার পেট আটটি খণ্ডক দিয়ে গঠিত।



59 নং চিত্র— মশার জীবনের বিভিন্ন দশা (বাঁদিকে কিউলেক্স, ডানদিকে অ্যানোফিলিস) : ক. ও ক´. ডিম ; খ. ও খ´ শূক ; গ. ও গ´. পুত্তলি ; ঘ. ও ঘ´. সমঙ্গ।

মশার-ও জীবনে ডিম, শূক, পুত্তলি এবং সমঙ্গ— এই চারটি দশা আছে। অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স এবং ঈডিসের জীবনের বিভিন্ন দশার মধ্যে কম-বেশি পার্থক্য দেখা যায়। 59 নং চিত্রে

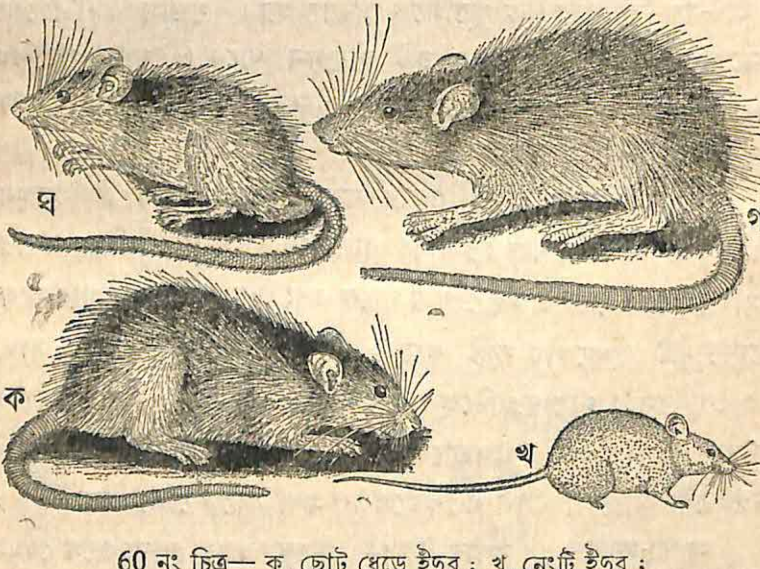
কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিসের জীবনের বিভিন্ন দশা দেখানো হল। তবে, সব মশার-ই জীবনের গতি-প্রকৃতি মোটামুটি একই রকম। স্ত্রী-মশা সাধারণতঃ বদ্ধ ও অপরিচ্ছন্ন জলে এককালীন কয়েকশ' ডিম পাড়ে। ডিমগুলি জলে ভাসতে থাকে। কিউলেক্সের ডিমগুলি দলবদ্ধভাবে, কিন্তু অ্যানোফিলিসের ডিমগুলি আলাদা আলাদাভাবে ভাসে। কয়েকদিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূক বের হয় এবং শূকগুলি জলে কিল্‌বিল করতে থাকে। এরা মোট চার বার খোলস ত্যাগ করে। শান্ত অবস্থায় অ্যানোফিলিসের শূক জলের উপরের তলের সঙ্গে মোটামুটি সমান্তরালভাবে থাকে, কিন্তু কিউ-লেক্সের শূক জলের উপরের তলের সঙ্গে সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে থাকে। আট-দশ দিন পরে শূক পুত্তলিতে পরিণত হয়। পুত্তলি 'কমা'-চিহ্নের মতো দেখতে। এর দেহে দুটি বায়ু-নল থাকে। মশার পুত্তলিও জলের মধ্যে নড়াচড়া করে বেড়ায়। দিন কয়েক পরে পুত্তলি থেকে সমঙ্গ মশা বেরিয়ে আসে।

অ্যানোফিলিস মশার ওড়ার সময় শব্দ হয়; কিন্তু কিউলেক্স মশার ওড়ার সময় শব্দ হয় না। বসার সময় অ্যানোফিলিস মশার মাথা, বুক ও পেট একই রেখায় থাকে এবং দেহ বসার জায়গার সঙ্গে মোটামুটি সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে; কিন্তু, কিউলেক্স মশার মাথা ও পেট বসার জায়গার দিকে ঝুঁকে থাকে এবং দেহ বসার জায়গার সঙ্গে মোটামুটি সমান্তরালভাবে থাকে। এই দুটি প্রধান পার্থক্যের সাহায্যে অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশা সহজে চেনা যায়।

মশা-দমন ঃ মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে হলে যেমন পূর্ণাঙ্গ মশা ধ্বংস করা প্রয়োজন, তেমনি মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা-ও দরকার। ডি.ডি.টি. এবং অন্যান্য কীট-নাশক উপদ্রুত অঞ্চলে ছড়িয়ে মশা ধ্বংস করা যায়। ধূপ, ধুনা ইত্যাদির ধোঁয়া দিলে মশা পালিয়ে যায়। জলে কেরোসিন অথবা ঐরকম অন্য কোনও রাসায়নিক দ্রব্য দিলে, শ্বসনের ব্যাঘাতের ফলে মশার শূক ও পুত্তলি মরে যায়। তে-চোখো, খলিসা ইত্যাদি মাছ মশার শূক ও পুত্তলি

খেয়ে, মশার বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। মশা যেসব জায়গায় ডিম পাড়ে সেই সমস্ত জায়গা পরিষ্কার রেখে, মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা যাইতে পারে।

ইঁদুর ঃ ভারতে অনেক ধরনের ইঁদুর পাওয়া যায়। এর মধ্যে মোটামুটি পাঁচ ধরনের ইঁদুর মানুষের ক্ষতি করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ গৃহস্থালির উপদ্রব। এরা কাঠের দরজা-জানালায় এবং মাটির ও কাঠের মেঝেতে গর্ত করে; চামড়া, জামা-কাপড়, বই-পত্র এবং কাঠের আসবাব-পত্র কেটে তছনছ করে। এরা শস্যের প্রচুর ক্ষতি করে। মেঠো ইঁদুরেরা ধানগাছের শীষ কেটে নিয়ে, মাটির ভিতরের গর্তে জমা করে রাখে। ইঁদুরের গোলায় অথবা শস্য-ভাণ্ডারে জমা



60 নং চিত্র— ক. ছোট ধেড়ে ইঁদুর; খ. নেংটি ইঁদুর;
গ. বড় ধেড়ে ইঁদুর; ঘ. ইঁদুর।

করে রাখা খাদ্যশস্যও প্রচুর প্ররিমাণে নষ্ট করে। ভারতে প্রতি বৎসর 50 কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য ইঁদুরেরা নষ্ট করে ফেলে। এছাড়া, ইঁদুরের দ্বারা বৈদ্যুতিক তার ক্ষতিগ্রস্ত করে, অগ্নিকাণ্ড ঘটানো এবং রেল-লাইনের নিচে গর্ত করে, রেল-দুর্ঘটনা ঘটানোর নজির-ও পাওয়া যায়। কয়েক ধরনের ইঁদুরের দেহে এক রকম উপমক্ষিকা

বাস করে। এই উপমক্ষিকা বিউবোনিক প্লেগ(**Bubonic plague**) -এর জীবাণু বহন করে। এক সময়ে (1898 থেকে 1948 পর্যন্ত) ভারতে প্রতি বৎসর এক লক্ষেরও বেশি লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। এছাড়া, ইঁদুরের দেহে বসবাসকারী এঁটেল পোকার সাহায্যে **মুরিন টাইফাস** (Murine typhus) নামের মারাত্মক রোগ সংক্রামিত হয়।

ইঁদুর স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের দেহ লাল্‌চে অথবা ছাই রঙের লোম দিয়ে ঢাকা এবং **মাথা, গলা,** ধড় ও লেজ— এই চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত। এদের মুখের কাছে লম্বা লম্বা গুম্ফ থাকে। ইঁদুরের সামনের দিকের দুজোড়া দাঁত খুব ধারালো ও শক্তিশালী। এই দাঁত দিয়ে এরা আসবাব-পত্র, শীষ ইত্যাদি কাটে। এদের অগ্রপদ ও পশ্চাৎ পদের আঙুলের ডগায় যে নখর থাকে, তা দিয়ে এরা মাটি খোঁড়ে।

ইঁদুর স্বভাবে প্রধানতঃ নিশাচর এবং অতিভোজী। একটি ইঁদুর সপ্তাহে গড়ে এক থেকে দেড় কিলোগ্রাম খাদ্য খায়। ক্ষুধার্ত বড় ধেড়ে ইঁদুর গৃহপালিত হাঁস-মুরগির বাচ্চা ও ডিম খেয়ে ফেলে। সময় সময় এরা মানুষকে কামড়াতেও দ্বিধাবোধ করে না।

তিন মাস বয়সের পর থেকে ইঁদুর বাচ্চা প্রসব করতে শুরু করে। এরা এককালীন 6টি থেকে 10টি বাচ্চা প্রসব করে। সদ্যোজাত বাচ্চার কান ও চোখ বন্ধ থাকে এবং দেহে লোম থাকে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার দুদিন পরে কান এবং পনেরো দিন পরে এদের চোখ ফোটে। তিন সপ্তাহ বয়স থেকে এরা উৎপাত শুরু করে।

ইঁদুর-দমন ঃ নানাধরনের জাতিকল ও খাঁচাকল পেতে ইঁদুর মারা অথবা ধরা হয়। খাদ্যের সঙ্গে বেরিয়াম কার্বোনেট (Barium carbonate), জিঙ্ক্ ফস্‌ফাইট (Zinc phosphite) ইত্যাদি ইঁদুর-মারা বিষ মিশিয়ে, ইঁদুর মারা হয়।

অনুশীলনী

1. ছত্রাক থেকে তৈরী হয় এমন একটি মূল্যবান ঔষধের নাম লেখ। এই ঔষধের আবিষ্কর্তা কে ? ছত্রাকটির দেহ-গঠন বর্ণনা কর।

2. ধুতুরা-গাছ সম্বন্ধে যা জান লেখ। ঐ গাছ থেকে কি ঔষধ হয়?

3. সর্পগন্ধা-গাছ থেকে কি ঔষধ তৈরী হয়? কিভাবে এর চাষ করা হয়?

4. মাছি কি কি রোগ বিস্তার করে? মাছির দেহ-গঠন ও জীবনের বিভিন্ন দশা বর্ণনা কর। কিভাবে মাছি দমন করা হয়?

5. ভারতে মশা কি কি রোগ বিস্তার করে?

6. ইঁদুর কিভাবে মানুষের অপকার করে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

7. নিচের বাক্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে **হ্যাঁ** এবং যেটি ভুল, তার পাশে **না** লেখ :—

(ক) পেনিসিলিয়াম থেকে স্ট্র্যামোনিয়াম নামের উপক্ষার পাওয়া যায়। (খ) সর্পগন্ধার মূল থেকে রাউল্‌ফিন নামের উপক্ষার পাওয়া যায়। (গ) ধুতুরার বীজ থেকে পেনিসিলিন তৈরী হয়। (ঘ) মাছি ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তার করে। (ঙ) কিউলেক্স মশা ডেঙ্গুজ্বর বিস্তার করে। (চ) ইঁদুর শস্যের প্রচুর ক্ষতি করে।

8. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) — পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। (খ) — থেকে রাউল্‌ফিন নামের উপক্ষার পাওয়া যায়। এই উপক্ষার — রোগের ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (গ) ধুতুরার — ও — থেকে — নামক উপক্ষার পাওয়া যায়। (ঘ) মাছির লার্ভাকে — বলে। (ঙ) ভারতে —, — ও — নামে তিন রকমের মশা দেখা যায়। (চ) ইঁদুরের গায়ে — থাকে; এই — — রোগের জীবাণু বহন করে।

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

7

আগে নানারকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সহজপ্রাপ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ, কিছু কিছু সহজ পরীক্ষা এবং সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সহজসাধ্য এইরকম কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হল।

উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ ঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে এদের বার বার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা দরকার। কিন্তু, সব জায়গায়, সব সময়ে, সব রকম উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেখা মেলে না। সেজন্য, সুযোগ-সুবিধা মতো এদের সংগ্রহ করে প্রয়োজনমতো, যে-কোনও সময়ে এদের পরীক্ষা করা যেতে পারে।

কোনও উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী সংগ্রহ করতে হলে, তাদের কোন পরিবেশে, কোন ঋতুতে এবং কোন সময়ে পাওয়া সহজ, তা আগে থেকে জানা থাকলে ভালো হয়। তবে, সব সময় এরকম করা সম্ভব না-ও হতে পারে। সেইজন্য, সময়-সুযোগমতো, আশেপাশে যে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়, তাদের সংগ্রহ করে রাখলেও চলে।

শহরেই হোক অথবা গ্রামেই হোক— সব জায়গাতেই কম-বেশি উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়। গ্রামে, বন-জঙ্গলে, ফসল ক্ষেতের ধারে জলা-জমিতে অনেক বেশি রকমের এবং অনেক বেশি সংখ্যায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেখা মেলে। কাজেই, সহজে নানারকম উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করতে হলে, এই সমস্ত জায়গায় যাওয়া ভালো।

উদ্ভিদ সংগ্রহ করার সময় কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা দরকার। যেমন— সপুষ্পক উদ্ভিদ সংগ্রহের সময়, যতদূর সম্ভব পুষ্প অথবা পুষ্পবিন্যাস এবং ফল-সহ উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে হয়। সরিষা, ন'টে, দূর্বাঘাস ইত্যাদি বীরুৎ-শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মূল ও কাণ্ড-সহ সমগ্র উদ্ভিদটি সংগ্রহ করতে হয়। আমের ছোট গুটি ও মুকুলযুক্ত শাখা সংগ্রহ করাই ভালো। বাব্‌লা, কুল ইত্যাদি কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ

এবং সংগ্রহের সময় যাতে হাতেকাঁটা ফুটে না যায়, তার জন্য সাবধান হতে হবে। বিছুটি ও ঐরকম বিষাক্ত উদ্ভিদ সংগ্রহের সময়ও সাবধান হওয়া দরকার।

প্রাণী, ভীমরুল, বোল্‌তা, বিছা, সাপ ইত্যাদি বিষধর প্রাণী সংগ্রহের সময় খুব সাবধান হতে হবে। না হলে, এরা হুল ফুটিয়ে অথবা কামড়ে দিতে পারে। এদের হাত দিয়ে না ধরাই ভালো। কেউটে, চন্দ্রবোড়া ইত্যাদি বিষধর সাপ ধরতে চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রজাপতি ও অন্যান্য উড়ন্ত পতঙ্গ ধরার জন্য কাপড়ের তৈরী এক রকম জাল পাওয়া যায়। দুহাতে দুটি কচুপাতা নিয়ে বসা প্রজাপতিকে দুদিক দিয়ে সাবধানে চেপে ধরে, সহজে প্রজাপতি সংগ্রহ করা যায়। শুধু হাত দিয়ে প্রজাপতি ধরা উচিত নয়। কারণ, প্রজাপতির ডানায় যে গুঁড়া গুঁড়া আঁশ থাকে, সেগুলি হাতে লেগে প্রজাপতির ডানার রঙ নষ্ট হয়ে যায়। খাঁচাকল অথবা জাঁতিকল পেতে ইঁদুর ও ছুঁচা ধরা যায়। ফাঁদ পেতে পাখি ধরা যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করার পর, এদের সংরক্ষণ করা দরকার। সংরক্ষণ না করলে, উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী পচে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা পোকায় কেটে নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে এক-একরকম উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ করা হয়। সরিষা-গাছ অথবা আমের শাখা ইত্যাদি উদ্ভিদ কিংবা উদ্ভিদের অংশ প্রয়োজন-মতো জলে ধুয়ে অথবা ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া দরকার, যাতে এদের গায়ে মাটি অথবা ধূলা-বালি লেগে না থাকে। পরে ঐগুলি চোষ-কাগজের মধ্যে রেখে, কোনও ভারী জিনিষ চাপা দিয়ে, কয়েক দিন রাখতে হয়। এইরকম করলে, সংগৃহীত উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। তখন শুক্‌না উদ্ভিদকে এক টুকরা পুরু কাগজের উপর রেখে, আঠা দিয়ে কাগজের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে। কাগজের নিচের দিকে, ডানদিকের কোণায় নিচের তথ্যগুলি লিখে রাখতে হয়।

সংগৃহীত উদ্ভিদের নাম .... সংগ্রাহকের নাম ....

সংগ্রহের স্থান ... . সংগ্রহের তারিখ ....

সংরক্ষিত উদ্ভিদগুলিকে মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া, এবং উদ্ভিদগুলির উপরে ন্যাপ্‌থিলিন (Napthelene) গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এতে উদ্ভিদগুলিতে পোকা লাগতে পারে না।

রসালো কাণ্ড (আদা, ফণিমনসা) অথবা ভাণ্ডার মূল (যেমন, মুলা,গাজর ইত্যাদি) এইভাবে শুকিয়ে রাখা অসুবিধা। এদের শতকরা ৫ভাগ ফর্মালিন (Formalin)* দ্রবণে রেখে, সংরক্ষণ করা হয়।

সংগৃহীত প্রাণী সংরক্ষণের আগে মেরে ফেলা দরকার। ইঁদুর, ছুঁচা ইত্যাদি প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা যেতে পারে।

পতঙ্গ মারার জন্য ছিপিযুক্ত একটি মোটা কাচের টিউব (Tube) নেওয়া দরকার। অল্প একটু তুলা বেনজিন (Benzene) নামের তরলে ভিজিয়ে, ভিজা তুলা টিউবের মধ্যে দিয়ে, তার উপরে এক টুকরা চোষ-কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। পতঙ্গ ধরার পর, তাদের ঐ টিউবের মধ্যে রেখে, ভালভাবে ছিপি বন্ধ করে দিলে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পতঙ্গ মরে যাবে। মাছকে গরম জলে ডুবিয়ে দিলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে যায়।

মেরে ফেলার পর পতঙ্গদের বুক-অঞ্চলে, উপরের দিক থেকে নিচের দিকে একটি সরু ও ধারালো আল্‌পিন প্রবেশ করিয়া দিয়ে, পতঙ্গ-সহ আল্‌পিনটিকে শোলার উপর ফুটিয়ে রাখতে হয়।

অনেকগুলি পতঙ্গ এক টুকরা শোলার উপর এইভাবে রেখে, শোলার টুকরাটিকে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। বাক্সের মধ্যে ন্যাপ্‌থিলিন গুঁড়া দেওয়া দরকার।

মাছ, ইঁদুর, টিক্‌টিকি, ব্যাঙ— এই সমস্ত প্রাণীদের শতকরা চার ভাগ ফর্মালিন** দ্রবণে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। ফর্মালিন দ্রবণে ডুবানোর আগে, এই সমস্ত প্রাণীর পেট চিরে দেওয়া খুব-ই দরকার।

* এক ভাগ ফর্মালিনের সঙ্গে উনিশ ভাগ জল মিশালে, শতকরা ৫ভাগ ফর্মালিন দ্রবণ তৈরী হয়।

** এক ভাগ ফর্মালিনের সঙ্গে নভাগ জল মিশালে, শতকরা চার ভাগ ফর্মালিন দ্রবণ তৈরী হয়।

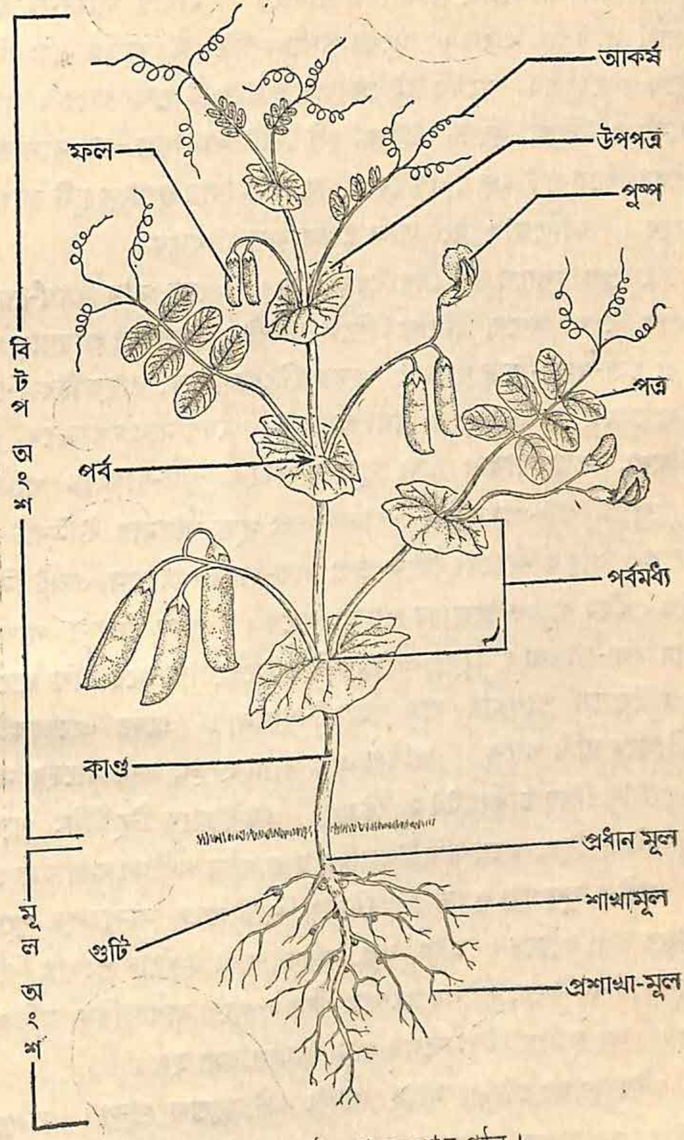
পেট না চিরলে, পেটের মধ্যে ফর্মালিন দ্রবণ প্রবেশ করতে পারে না। ফলে, প্রাণীটি খুব তাড়াতাড়ি পচে যাবে। 24 ঘণ্টা ফর্মালিন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখার পর, ঐ দ্রবণ ফেলে দিয়ে, আবার নূতন দ্রবণে প্রাণীটিকে ডুবিয়ে রাখলে, অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না। শিশির গায়ে, আগের মতো সংগৃহীত প্রাণীর নাম ইত্যাদি লেখা একটি কাগজ সেঁটে দিতে হয়। পতঙ্গের ক্ষেত্রে, এক টুকরা ছোট কাগজে ঐসব তথ্য লিখে, পতঙ্গের সঙ্গে কাগজটিকেও পিন ফুটিয়ে রাখতে হয়।

মটর গাছের বাহ্য গঠন ঃ ষষ্ঠ শ্রেণীতে উদ্ভিদের মৌলিক বাহ্য গঠন প্রসঙ্গে মটর গাছের কথা বলা হয়েছে। ফুল ও শুঁটিযুক্ত একটি মটরগাছকে সাবধানে মাটি থেকে তুলে, জল দিয়ে মাটি ধুয়ে ফেলে, ট্রে (Tray) অথবা এক টুকরা সাদা কাগজের উপর রাখতে হয়। এর পর বাহ্য গঠন পরীক্ষা করা যেতে পারে।

মটর গাছের যে অংশ মাটির নিচে ছিল (অর্থাৎ, চলতি কথায় যাকে শিকড় বলে), তার রঙ সবুজ নয়, বরঞ্চ কিছুটা সাদাটে। এর নাম **মূল অংশ**। মোটা মূলটির নাম **প্রধান মূল**। এর গা থেকে যে সরু মূল বের হয়েছে, তার নাম শাখামূল। আবার, শাখামূলের গা থেকে আরও সরু **প্রশাখা-মূল** বের হয়েছে। বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করলে, মূলের গায়ে অনেকগুলি ছোট ছোট **গুটি** দেখা যায়।

মটর গাছের মাটির উপরের অংশে রঙ সবুজ। এর নাম **বিটপ অংশ**। এই অংশের প্রধান অক্ষকে **কাণ্ড** বলে। কাণ্ডের গা থেকে **শাখা** বের হয়। শাখা অথবা কাণ্ডের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পত্র বের হয়। ঐ জায়গাগুলিকে **পর্ব** বলে। পর পর দুটি পর্বের মাঝেখানের অংশকে বলা হয় **পর্বমধ্য**। পত্রের গোড়ায় দুটি সবুজ পাতার মতো **উপপত্র** আংশিক জোড়া থাকে।

মটর গাছের পত্র **যৌগিক পত্র**। একটি ডাঁটির দুপাশে তিন-চারটি করে **অণুফলক** লাগানো থাকে। শেষ তিনটি অণুফলক আকর্ষ হয়ে যায়। কাণ্ড অথবা শাখার কক্ষে **পুষ্প** ও ফল থাকে।



61 নং চিত্র— মটর গাছের বাহ্য গঠন।

রুই মাছের বাহ্য গঠন ঃ একটি মরা রুই মাছকে ট্রে-র উপর রেখে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই মাছের দেহ পাশাপাশি অল্প চাপা এবং **মাথা, ধড়,** এবং **লেজ**— এই তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত।

রঙ কতকটা লাল্‌চে, পেটের দিক সাদাটে। মাথার সামনের দিকে আড়াআড়ি মুখ থাকে। মুখের উপরের দিকে ঊর্ধ্বোষ্ঠ এবং নিচের দিকে নিম্নোষ্ঠ। মুখের তুই কোণায় তুটি ছোট গুম্ফ থাকে। মাথার সামনের দিকে, মুখের উপরে, তুটি ছোট নাসারন্ধ্র এবং নাসারন্ধ্রের পিছন দিকে তুটি বড় চোখ দেখা যায়। মাথার তুপাশে তুটি কানকো থাকে। কানকোর নিচে লাল রঙের ফুলকা থাকে।

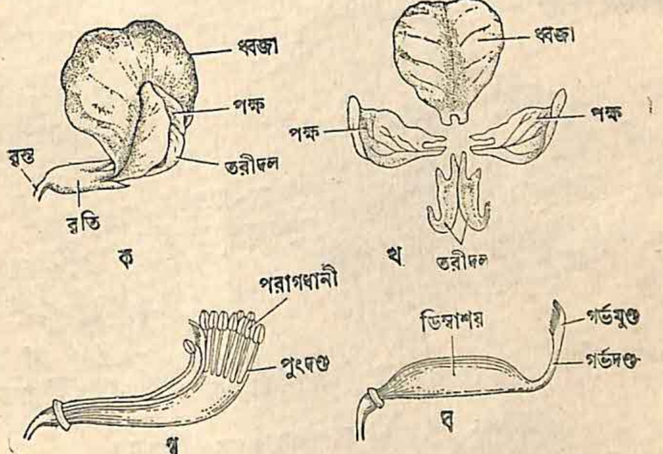
দেহের তুপাশে তুটি রেখা দেখা যায়। এদের নাম পার্শ্ব-রেখা। ধড়ের শেষ অংশে, নিচের দিকে একটি অল্প ফোলা জায়গায় পায়ু এবং মূত্র-জনন-ছিদ্র থাকে। ধড়ের পিঠের দিকে, পায়ুর ঠিক পিছনে এবং লেজে একটি করে পাখনা থাকে। এদের নাম যথাক্রমে পৃষ্ঠ-পাখনা, পায়ু-পাখনা এবং পুচ্ছ-পাখনা। পৃষ্ঠ-পাখনায় পনেরো-ষোলোটি, পায়ু-পাখনায় ছয়-সাতটি এবং পুচ্ছ-পাখনায় উনিশটি রশ্মি থাকে। ধড়ের সামনের দিকে এবং মাঝ-বরাবর অঞ্চলে, একটু নিচের দিক ঘেঁষে আরও তুজোড়া পাখনা থাকে। প্রথম জোড়া পাখনার নাম বক্ষ-পাখনা। এদের প্রত্যেকটিতে সতেরোটি করে রশ্মি থাকে। অন্য জোড়া পাখনার নাম শ্রোণী-পাখনা। এদের প্রত্যেকটিতে নটি করে রশ্মি থাকে। পাখনা এবং মাথা ছাড়া, রুই মাছের সমস্ত দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা (24 নং চিত্র)। একইভাবে টিক্‌টিকি, পায়রা, গিনিপিগ, ইঁতুর, প্রজাপতি ইত্যাদির বাহ্য গঠন পরীক্ষা করা যায়।

মটর ফুলের গঠন ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নানারকম পুষ্পের বিষয়ে বলা হয়েছে। মটর, বক, সরিষা, জবা ইত্যাদি পুষ্পের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে, এইসব পুষ্পের গঠন সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হয়। পর পৃষ্ঠায় মটর ফুলের গঠন বিষয়ে বলা হল।

মটর ফুলের বোঁটা আছে, অর্থাৎ এটি সবৃন্তক পুষ্প। সবচেয়ে বাইরে যে স্তবক, তার নাম বৃতি। মটর ফুলের বৃতি সবুজ এবং বোঁটার দিকে নলের মতো। বৃতির শেষে পাঁচটি পৃথক খণ্ড থাকে। তা দেখে বোঝা যায়, মটর ফুলের বৃতির পাঁচটি বৃত্যংশ।

বৃতিকে ধারালো ছুরি অথবা ব্লেড (Blade) দিয়ে সাবধানে কেটে

বাদ দিলে, পরের স্তবক অর্থাৎ **দলমণ্ডল**-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত দেখা যায়। দলমণ্ডলের রঙ সাদা অথবা হাল্কা বেগুনী। এতে পাঁচটি পাপড়ি বা **দলাংশ** থাকে। পাঁচটি দলাংশই এক রকম নয়,



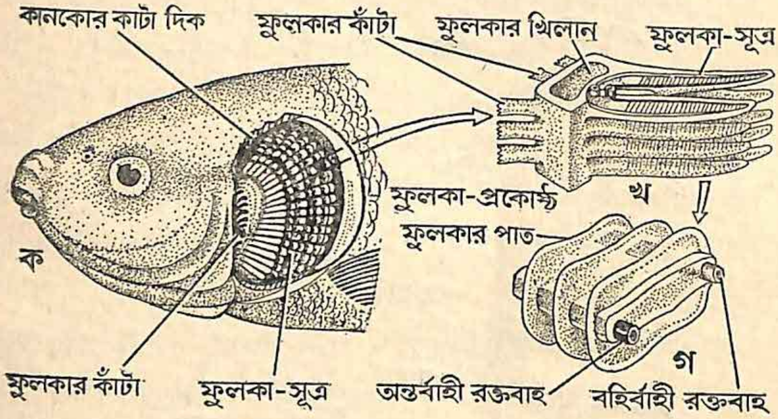
62 নং চিত্র— মটর ফুলের বিভিন্ন অংশ : ক. সমগ্র পুষ্প ; খ. দলমণ্ডল ; গ. পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক ; ঘ. গর্ভপত্র।

তিন রকম। বাইরেরটি সবচেয়ে বড়। এর নাম **ধ্বজা**। এর পরে, পাশাপাশি যে দুটি দলাংশ থাকে, তাদের নাম **পক্ষ**। এরা মাঝারি আকারের। সবচেয়ে ভিতরে থাকে দুটি সবচেয়ে ছোট পাপড়ি। এদের নাম **তরীদল**। এক টুকরা কাগজের উপর অথবা ট্রে-র উপর দলাংশগুলিকে 62 নং চিত্র-খ-এর মতো করে সাজাতে হয়।

দলমণ্ডলের পরের স্তবককে বলে **পুংস্তবক**। এতে মোট দশটি **পুংকেশর** থাকে। পুংকেশরের দুটি অংশ— সুতার মতো **পুংদণ্ড** এবং পুংদণ্ডের মাথায় ফোলা **পরাগধানী**। নটি পুংকেশরের পুংদণ্ডগুলি অল্প কিছুদূর একসঙ্গে জুড়ে একটি নলের মতো অংশ তৈরী করে। বাকী পুংকেশরটি আলাদা থাকে।

ব্লেড দিয়ে সাবধানে পুংস্তবকটি আলাদা করলে, স্ত্রীস্তবক বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীস্তবক একটিমাত্র **গর্ভপত্র** দিয়ে তৈরী। এর গোড়ার দিক মোটা। এই অংশের নাম **ডিম্বাশয়**। পরের অংশ সরু ও অল্প বাঁকা। এর নাম **গর্ভদণ্ড**। গর্ভদণ্ডের শেষে থাকে **গর্ভমুণ্ড**।

মাছের ফুলকা প্রদর্শন ঃ রুই এবং অন্যান্য মাছের প্রতি পাশে, কানকোর নিচে ফুলকা-প্রকোষ্ঠে চারটি করে চার জোড়া লাল রঙের ফুলকা পাশাপাশি সাজানো থাকে।



63 নং চিত্র— মাছের ফুলকার অংশ-বিশেষ।

প্রতিটি ফুলকায় একটি করে বাঁকা কাঠির মতো অংশ থাকে। থাকে। একে বলা হয় **ফুলকার খিলান**। ফুলকার খিলানের উত্তল পৃষ্ঠ থাকে বাইরের দিকে। এই উত্তল পৃষ্ঠের সঙ্গে দুসারি সরু সরু সুতার মতো অংশ যুক্ত থাকে। এদের নাম **ফুলকা-সূত্র**। ফুলকা-সূত্রের গোড়ার দিকে পর পর দুটি সূক্ষ্ম রক্তবাহ থাকে— ভিতরেরটিকে **বহির্বাহী রক্তবাহ**, এবং বাইরেরটিকে **অন্তর্বাহী রক্তবাহ** বলে। প্রতিটি ফুলকা-সূত্রে অসংখ্য সূক্ষ্ম পাতের মতো অংশ আড়াআড়িভাবে সাজানো থাকে। এদের নাম **ফুলকার পাত**। ফুলকার খিলানের অবতল পৃষ্ঠ মাছের গলবিলের দিকে থাকে। এই অবতল পৃষ্ঠের সঙ্গে কতকগুলি সূক্ষ্ম কাঠির মতো অংশ লেগে থাকে। এদের নাম **ফুলকার কাঁটা**।

অঙ্কুরোদগমের পরীক্ষা ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদে অঙ্কুরোদগমের শর্ত বর্ণনার সময় একটি পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে অঙ্কুরোদগমের বিষয়ে একটি সাধারণ পরীক্ষা দেওয়া হল। এটি খুব সহজে করা যায়।

এই পরীক্ষার জন্য লাগবে গোটা কয়েক মটর বীজ, একটি টব

এবং উর্বর জমির কিছু মাটি। টব মাটি দিয়ে ভর্তি করে, জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। পরে মটর বীজগুলি ভিজা মাটির উপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই অবস্থায় টবটিকে এমন জায়গায় রেখে দিতে হবে, যাতে পাখিতে মটর বীজগুলি খেয়ে যেতে না পারে। রোজ পরিমাণমতো জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

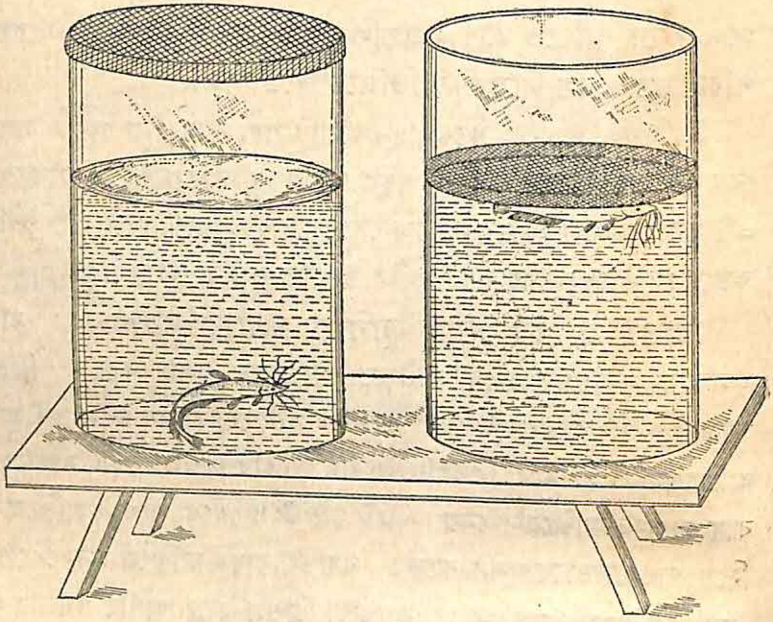
টবটিকে এইভাবে কয়েকদিন রাখার পর, মটর বীজ থেকে অঙ্কুর বের হতে দেখা যাবে। ক্রমে অঙ্কুর মাটির মধ্যে চলে যেতে থাকবে। এই সময়ের মধ্যে ভ্রূণমুকুল বীজ থেকে বেরিয়ে এসে কচি কাণ্ড তৈরি করবে। বীজত্বক্-সহ বীজ মাটির উপরের তলেই থেকে যাবে।

জিওল মাছকে জলে ডুবিয়ে মারার পরীক্ষা ঃ মাছ ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শ্বসন করে। কিন্তু, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র-যুক্ত মাছেরা ফুলকার সাহায্যে যেমন জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে, তেমনি আবার অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বায়ু থেকেও অক্সিজেন নেয়। এই দুই উৎস থেকে পাওয়া অক্সিজেন দিয়ে এরা সুষ্ঠুভাবে শ্বসন করে। বস্তুতঃ, বায়ুর অক্সিজেন না পেলে, এরা বেশিক্ষণ বাঁচে না। কাজেই, জিওল মাছ অর্থাৎ অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র-যুক্ত মাছকে জলের বাইরে না এনেও ডুবিয়ে মারা যায়।

পরীক্ষা ঃ দুটি একই মাপের কাচের জারের চার ভাগের তিন ভাগ পুকুরের জল দিয়ে পূর্ণ করা হল এবং প্রত্যেক জারে একটি করে সুস্থ, সবল শিঙি মাছ ছেড়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় জারের জলের উপরিতল-বরাবর এক টুকরা তারের জাল শক্তভাবে আট্‌কে দেওয়া হল। যাতে মাছটি লাফিয়ে পালাতে না পারে সেইজন্য, প্রথম পাত্রের মুখও (চিত্রের মতো) আর এক টুকরা তারের জাল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। এই অবস্থায় পাত্র দুটিকে পাশাপাশি রেখে দেওয়া হল।

নিরীক্ষা ঃ প্রথম পাত্রের মাছকে মাঝে মাঝে জলের উপরে এসে বায়ু নিতে দেখা গেল। দ্বিতীয় পাত্রের মাছও একইভাবে বার বার বায়ু নিতে চেষ্টা করল ; কিন্তু, তারের জালে বাধা পেয়ে আবার

নিচে নেমে গেল এবং মুখ দিয়ে বেশি জল নিতে থাকল। ফলে, মাছটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে, কয়েক ঘণ্টা পরে মরে গেল।



64 নং চিত্র— জিওল মাছকে জলে ডুবিয়ে মারার পরীক্ষা।

সিদ্ধান্ত ঃ পাত্রর জলেই অক্সিজেন দ্রবীভূত ছিল। কেবল জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নিয়ে দ্বিতীয় পাত্রের শিঙি মাছটি বেশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে শ্বসন করতে পারল না। ক্রমশঃ, শ্বাসকষ্ট শুরু হল এবং জল থেকে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন নেওয়ার জন্য, মুখ-গহ্বরে বেশি করে জল নিতে থাকল। কিন্তু, শুধু জলে দ্রবীভূত, অক্সিজেনে তার প্রয়োজন মিটল না ; বায়ুর অক্সিজেনের অভাবে অবশেষে মাছটি মরে গেল। সুতরাং, জিওল মাছ ফুলকা দিয়ে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন, এবং অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র দিয়ে বায়ু থেকে অক্সিজেন নিয়ে শ্বসন করে।

মন্তব্য ঃ বলা বাহুল্য, খাদ্যের অভাবে দ্বিতীয় পাত্রের মাছটি মরে নি ; কারণ, প্রথম পাত্রের মাছটি খাদ্য ছাড়াও বেঁচে ছিল।